ছোটদের নজরুল

বন্দে আলী মিয়া

ছোটদের নজরুল

বন্দে আলী মিয়া

অনির্বাণ

www.phulkuri.org.bd

প্রকাশক

তাছনীম আহমদ
অনির্বাণ
১৫২/২- জে গ্রীণ রোড, ঢাকা-১২০৫

অনির্বাণ প্রথম মুদ্রণ

এপ্রিল ২০০৯ / বৈশাখ ১৪১৬

দ্বিতীয় মুদ্রণ

সেপ্টেম্বর ২০১২ / ভাদ্র ১৪১৯

প্রচ্ছদ

রায়হান জামিল

অক্ষর বিন্যাস

ইয়াশা কম্পিউটার
২০ পি. কে. রায় লেন, বাবুবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ

বেলাল অফসেট প্রেস
৪ পি. কে. রায় লেন, বাবুবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য

ষাট টাকা মাত্র

ISBN 984 407 087 4

একমাত্র পরিবেশক

আহমদ পাবলিশিং হাউস

www.phulkuri.org.bd

ভূমিকা

কাজী নজরুল ইসলাম-বাংলা সাহিত্যে অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। যাঁর নাম স্মরণমাত্র শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে ওঠে আমাদের মন। বহু বিশেষণে বিভূষিত তাঁর প্রতিভা। অনগ্রসর বাঙালি মুসলমানদের অগ্রযাত্রার তিনি মহান তূর্যবাদকের ভূমিকা পালন করেছেন। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের এক উত্তুঙ্গ মুহূর্তে বাংলা কাব্যে ও সঙ্গীতে রণবীণা বাজিয়ে 'হৈ হৈ করে' বাঙালি জাতির ঘুম ভাঙিয়ে আবির্ভূত হলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ নজরুলের এ আবির্ভাবকে অভিহিত করলেন 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' বলে। অন্যেরা বললেন এ 'জ্যৈষ্ঠের ঝড়।'

হ্যাঁ, জ্যৈষ্ঠেই জন্মেছিলেন নজরুল। একটি শূন্য হাঁড়ির সংসারে। অভিজাত অথচ দরিদ্র এই পরিবারটিতে নজরুলের যখন জন্ম হলো তখন অভাব ছাড়া আর কিছুই তিনি দেখেন নি। মা-বাবা গভীর ক্ষোভে কিশোর নজরুলের নাম রেখেছিলেন দুখু মিয়া। গ্রামের মক্তবে নজরুল বাংলাসহ আরবি-ফারসিতে জ্ঞান লাভ করলেও উচ্চ শিক্ষার সুবিধা থেকে ছিলেন বঞ্চিত। বস্তুতঃ 'সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত।' এ মনীষী কাব্যের অমর দৃষ্টান্ত নজরুলের শিক্ষা জীবন।

নজরুলের জীবনধারা বহু বৈচিত্রে উজ্জ্বল। কখনো লেটোর দলে, কখনো রুটির দোকানে, কখনো যুদ্ধ ক্ষেত্রে, কখনো পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে, কখনো কারাগারে অনশনরত—আবার কখনো গ্রামোফোন কোম্পানীর সৃষ্টি-নিমগ্ন গীতিকার, সুরকার। বিশ্ব সাহিত্যে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন এমন কবির সংখ্যা কম নয়; কিন্তু একটি জাতির সমগ্র মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করেছেন এমন কবির সংখ্যা নিঃসন্দেহে বিরল। নজরুল এই বিরলদৃষ্ট প্রতিভাবানদের একজন। সমালোচকদের অভিমত—বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে নজরুল বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ প্রতিভা। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মাইকেল (১৮২৪–১৮৭৩) ও রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১–১৯৪১) পর নজরুল যুগ প্রবর্তক কবিরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। তিনি নানা বিশেষণে ভূষিত। তাঁকে কেউ বলেন বিদ্রোহী কবি, কেউ বলেন প্রেমিক কবি, কেউ বলেন সৈনিক কবি, কেউ বলেন সাম্যবাদী কবি, কেউ বলেন চারণ কবি, কেউ বলেন বেদনার কবি। এইসব বিশেষণের কোনটাই তাঁর জন্য অযথার্থ নয়।

www.phulkuri.org.bd

মানুষের স্বাধীনতা ও অধিকারের পক্ষে সংগ্রাম করতে গিয়ে পৃথিবীর অনেক শিল্পী, সাহিত্যিক, দার্শনিক, শাসক-শোষকদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছেন। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবনেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। নজরুলের উপর সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের অন্যায়-অবিচারের কথা আমরা জানি। বিদ্রোহী কবি দাম্ভিক অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে সাহসের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন। তাঁর সাহস-আত্মবিশ্বাস এবং সত্যের প্রতি অবিচলিত আস্থা প্রকাশ দেখতে পাই 'রাজবন্দীর জবানবন্দীতে।'

নজরুলের খ্যাতি-অখ্যাতির সর্বোত্তম স্মারকচিহ্ন তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ অগ্নিবীণা (১৯২২)। ঘুমন্ত বাঙালি চিত্তে তিনি জাগালেন প্রাণের নতুন স্পন্দন। বাঙালির ললিত গীতির রাজ্যে তিনি আমাদের শোনালেন রণক্ষেত্রের তূর্যধ্বনি। তাঁর 'এক হাতে বাঁকা বাঁশরী, আর হাতে রণতূর্য।'

কর্মচঞ্চল নজরুলের সৃষ্টি প্রবাহ স্থায়ী ছিলো মাত্র দুই দশকের কিছু বেশি। ১৯১৯ থেকে ১৯৪১— কমবেশি ২২ বছর। এই স্বল্পকালের মধ্যে তাঁর কাছ থেকে আমরা পেয়েছি ২২টি কাব্যগ্রন্থ, ২টি কিশোর কাব্য, ৩টি উপন্যাস, ৩টি গল্প, ৩টি নাটক, ২টি কিশোর নাটিকা, ৫টি প্রবন্ধ গ্রন্থ, ২টি চলচ্চিত্র কাহিনী, ২টি রেকর্ড-নাট্য এবং গান কয়েক হাজার।

১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের ৫ এপ্রিল কলকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির রজত জুবলী উৎসবে নজরুল তাঁর জীবনের শেষ অভিভাষণে বলেছিলেন: 'যদি আর বাঁশী না বাজে, আমায় আপনারা ক্ষমা করবেন।' কি আশ্চর্য! সত্যি সত্যি এই অভিভাষণের পর নজরুলের কণ্ঠ আর বেজে ওঠেনি—স্তব্ধ হয়ে যায় তাঁর লেখনি। সুরের বুলবুল এক দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ১০ জুলাই থেকে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার বিশেষ কোন ব্যবস্থা হলো না। সুদীর্ঘ দশ বছর পর কয়েকজন গুণী মানুষের চেষ্টায় 'নজরুল নিরাময় সমিতি' গঠিত হলো। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের ১০ মে কলকাতা থেকে রওয়ানা হয়ে ৮ জুন লন্ডনে পৌছান। এখানে স্যারগ্যান্ট, ই এ বেটন, ম্যাক্‌কিসক এবং রাসেল ব্রেন কবিকে পরীক্ষা করেন। কিন্তু রোগ নির্ণয়ের ব্যাপারে তাঁরা একমত হতে পারেন নি। ফলে ৭ ডিসেম্বরে কবিকে লন্ডন থেকে ভিয়েনায় পাঠানো হয়। ভিয়েনার বিশ্ববিখ্যাত স্নায়ু বিশেষজ্ঞ ডাঃ হ্যান্স হফ্ কবিকে সযত্নে পরীক্ষা করেন এবং বলেন নজরুল 'পিকস ডিজিস' নামক এক দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিতে ভুগছেন। রোগ বর্তমানে এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে নিরাময়

www.phulkuri.org.bd

হবার কোন সম্ভাবনা নেই। অবশেষে তিনি এক ব্যবস্থাপত্র লিখে দেন। সেই ব্যবস্থাপত্রসহ ১৫ ডিসেম্বরে কবিকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনা হয়।

কবির চার পুত্রের প্রথম পুত্র আজাদ কামালের মৃত্যু হয় হুগলিতে অপরিণত বয়সে, আর দ্বিতীয় পুত্র বুলবুলের মৃত্যু হয় বসন্ত রোগে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে হুগলীর মস্‌জিদ বাড়ি স্ট্রিটে। তৃতীয় পুত্র কাজী সব্যসাচী ইসলাম (ডাকনাম সন ইয়াৎ সেন থেকে সানি) এবং চতুর্থ পুত্র কাজী অনিরুদ্ধ ইসলাম (ডাকনাম লেনিন থেকে নিনি)। কনিষ্ঠ কাজী অনিরুদ্ধ ইসলাম ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে অকালে পরলোকগমন করেন। কাজী সব্যসাচী ইসলামও দীর্ঘায়ু হলেন না। ১৯৭৯ সালের ৩ মার্চ তাঁর মৃত্যু ঘটে। সব্যসাচী দুই কন্যা-খিলখিল কাজী, মিষ্টি কাজী। এক পুত্র বাবুল কাজী এখন জীবিত। অনিরুদ্ধের বিধবা পত্নী কল্যাণী কাজী এবং দুই পুত্র কাজী অনির্বাণ, কাজী অরিন্দম ও এক কন্যা কাজী অনিন্দিতা বর্তমান। কবির কোন কন্যা সন্তান নেই।

দীর্ঘদিন দেশে বিদেশে নজরুলের চিকিৎসা ব্যর্থ হওয়ার পর বাংলাদেশ সরকার কবিকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করে ঢাকায় আনেন ১৯৭২ সালের ২৪ মে। বাংলাদেশের জনগণের প্রাণপ্রিয় কবি, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যে কবির সঙ্গীতের বাণীতে উদ্দেপিত হয়েছিল এ-দেশের অফুরন্ত প্রাণশক্তি, সেই নবজন্ম বাংলাদেশের মাটিতে কবি যখন ফিরলেন তখন তিনি বাক্‌শক্তিহীন। নির্বাক কবি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন এ-দেশের মানুষের অন্তরের ভালবাসা। ফুলে ফুলে ভরে গেল কবির বিশ্রাম শয্যা।

বাংলাদেশের মাটি, মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে কাজী নজরুল ইসলামের প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সূচনা ঘটে তাঁর কৌশোরেই। কৌশোর, যৌবন ও পরবর্তীকালে কবির জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ই অতিবাহিত হয়েছে বাংলাদেশের নানা অঞ্চলে, অনেক শহর ও গ্রাম জনপদে। কবির জীবনের শেষ অধ্যায়ও অতিবাহিত হয়েছে বাংলাদেশে। রাজধানী ঢাকা নগরীতেই রচিত হয়েছে তাঁর অন্তিম শয্যা। তিনি চির-নিদ্রায় শায়িত আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ সংলগ্ন শ্যামল মাটিতে। একটি গানে কবি লিখেছিলেন: 'মস্‌জিদেরই পাশে আমায় কবর দিও ভাই ....।' অনেক অপূর্ণ ইচ্ছার মাঝে অন্তিমে হয়তো এই একটি ইচ্ছাই তাঁর পূর্ণ হয়েছে। আল্লাহ্‌ তার আত্মার শান্তি দিন!

মোহাম্মদ আবদুল হাই

www.phulkuri.org.bd

www.phulkuri.org.bd

ছোটদের নজরুল

মস্‌জিদের মিনার থেকে শেষ রাতে শীতল হাওয়ায় ভেসে আসে মধুর আজান। ঝির্ ঝির্ করে ওঠে গাছের পাতা, তারপর পুকুরের ঢেউয়ে মিলিয়ে যায় তার রেশ। পুকুরের নাম পীর পুকুর।

ছায়া ঢাকা গাছতলা দিয়ে দুপুর বেলায় বৌঝিরা আসে গোসল করতে, পানি নিতে। তারা আবার ফিরে যায় গাছতলা দিয়ে। রৌদ্রদগ্ধ এই গাঁয়ে পানি ছিল না কোনো দিন। তখন এই গ্রামের হাজী পলোয়ান বলেছিলেন: একটি পুকুর আমি কাটবোই। এই গ্রামকে আমি তিলে তিলে শুকিয়ে যেতে দেবো না। পাড়ার সকল লোক সেদিন এই কথা শুনেছিল। তারা ভেবেছিল এই পালোয়ান লোকটার টাকা কোথায়! কিন্তু শক্তি ছিল হাজী পালোয়ানের শরীরে, ছিলো মনে।

দিনের পর দিন যায়। একদিন সবাই দেখলো যে, সারা জীবনের খাটুনীর অর্থ হাজী সাহেব তুলে রেখেছেন গ্রামের জন্য। তিনি বল্‌ছেন: আমি এবার পুকুর কাটাবো! আমি কথা দিয়েছি। মানুষের রক্ত শরীরে ধরে আমি সে কথা ভাঙবো কি করে?

শুরু হলো পুকুর কাটা। লাল মাটির স্তর পার হয়ে, কোদালের মুখে উঠতে লাগলো বালি। চললো কাজ। কোদালের ফলায় ঝক্‌ঝক্ করে উঠতে লাগলো সূর্যের সোনালী আলো। তারপর একদিন কালো মাটির নিচে থেকে প্রাণধারার মতো বেরিয়ে এলো পানির ঝরণা। কপালের ঘাম আঙ্গুলে ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়ান দীর্ঘ বলিষ্ঠ হাজী পালোয়ান—মুখে তাঁর স্বপ্ন সফলতার আনন্দ।

আনন্দে চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়লো পানি! জীর্ণ মসজিদের দিকে তাকিয়ে তাঁর মন শান্তিতে ভরে উঠলো। বললেন: হে খোদা, এ তো তোমারি দান। আকাশের হাওয়া, আলো, মাটি, পানি এ তোমার। মসজিদের ছায়া কাঁপতে লাগলো কাকচক্ষু পানিতে।

www.phulkuri.org.bd

দিন যায়, এখন আর শূন্য কলসীতে কাঁকন বাজিয়ে মেয়ে বৌ'কে ঘরে ফিরতে হয় না। সন্ধ্যায় তারা যখন ভরা কলসী নিয়ে ফেরে, তখন দেখতে পায় সেই জীর্ণ মসজিদের পাশে একটা কবর। সেই কবরের শিয়রে একটা প্রদীপ জ্বলছে। তারা বলে, তাদের হাজী সাহেব ওখানে ঘুমিয়ে আছেন। হাজী সাহেবকে ওরা ভুলতে পারে না। পীর পুকুরের প্রতি ঢেউয়ের সাথে তাঁর নাম জড়িয়ে আছে।

প্রতি ভোরে যখন আজান ভেসে আসে মসজিদ থেকে, তখন মনে হয় সেই সুর এসে থমকে থেমে যায় সেই কবরের ওপরে। কবরের গা থেকে ধীরে ধীরে খসে পড়ছে বালি বেরিয়ে পড়ছে ইটের পাঁজর। সন্ধ্যায় মাগরিবের নামাজ সেরে গ্রামের বৃদ্ধেরা এসে বসে সবুজের ছোপধরা ভাঙা ঘাটের সিঁড়িতে। তারা বলেন: ছিলেন আমাদের হাজী সাহেব, আর এখন এসেছেন আমাদের কাজী ফকির আহ্‌মদ।

বিষয়-সম্পত্তির মায়া ত্যাগ করে, পীর পুকুরের পাড়ে কবরের পাশে মসজিদকে সঙ্গী করে দিনের পর দিন কাটিয়ে দেন কাজী ফকির। ধর্মের প্রতি তাঁর খুব ভক্তি। অবাক্ হয়ে যায় সকলে। হিন্দু-মুসলমান ভেদ তাঁর কাছে নেই। সবার প্রতি সমান ভালবাসা। তাঁর কাছে আসে হিন্দু, আসে মুসলমান। মানুষ যদি সত্যি মানুষ হয়, তখন সে চেনে হৃদয়কে, তার কাছে ম্লান হয়ে যায় ধর্মের আবরণ। একটি হৃদয় আর একটি হৃদয়কে তখন টানে। সেই হৃদয় ছিল কাজী ফকির আহ্‌মদের।

লোকে বলে, পাটনার হাজীপুর গ্রামে নাকি ছিল তাঁদের আদি বাসভূমি। সেই হাজীপুর থেকে বহু বছর আগে চলে এসেছিলো এই পরিবারটি আসানসোলের চুরুলিয়া গ্রামে। তখন সে গ্রামের চেহারা ছিল অন্য রকম। রাজা নরোত্তম দাসের রাজধানী এই চুরুলিয়া। তৈরি হতো সেখানে নানারকম অস্ত্র-শস্ত্র। দূর থেকে ঘোড়ায় চেপে আসতো লোকজন। এসে পছন্দ করে নিয়ে যেত এই চুরুলিয়ার তৈরি অস্ত্র। আজও সেই ভাঙা ইটের স্তূপে কত কাহিনী জড়ানো। এইখানে আজও আছে চুরুলিয়া গড়!

মোগল আমলে এই গ্রামে ছিল বিচারালয়। যাঁরা বিচার করতেন তাঁদের বলা হতো কাজী। লোকে সেলাম করে বলতো; কাজী সাহেব। আজও লোকে কাজী কথাটা ভোলেনি। ঐ কাজীদেরই বংশধর ছিলেন ফকির আহ্‌মদ। তাঁরা বংশের উপাধিকে মাথায় করে রেখেছেন। ঐ দু'টি অক্ষরে ওঁদের পিতৃ-পুরুষদের গৌরবময় ইতিহাস লেখা রয়েছে। ওরা খানদানী বংশের লোক।

www.phulkuri.org.bd

তবু নিরহঙ্কার কাজী ফকির আহ্‌মদ খোদাতা'লাকে মনে রেখেছেন। ভাঙা মসজিদের একটি কোণে খোদার ধ্যানে রয়েছেন তিনি। ফকির আহ্‌মদের প্রথমা স্ত্রী মারা যাবার পর তিনি আবার বিয়ে করেন। একের পর একটি করে তাঁর চারটি সন্তান মারা গেল। পিতার বুকে একটার পর একটা আঘাত দিয়ে একটার পর একটা প্রদীপ নিভে গেল। তবু মসজিদের মিনার থেকে অতি প্রত্যুষে তাঁর আজানের সুরে ভেসে আসে। থর্ থর্ করে কাঁপে গাছের পাতারা—তারপর পীর পুকুরের ছোট্ট ঢেউভাঙা পানিতে মিলিয়ে যায় সে সুর।

•

১০ জ্যৈষ্ঠের রাত্রি। কাজী ফকিরের মন বেদনায় মলিন। তার এই পঞ্চম সন্তান যদি না বাঁচে, যদি জীবনের শেষ সম্বলকে ধরে রাখা না যায়! শেষ রাত্রিতে একটি শিশু জন্মলাভ করলো। এই অপার দুঃখের মাঝে যার জন্ম, তর নাম রাখা হল "দুখু"। দুখুর জন্মদিন ১৯০৬ সালের ১১ জ্যৈষ্ঠ।

তারপর দিনের পর দিন যায়—তারপর আসে মাস। মাসের টানে বছরও যায়। এমনি করে কয়েকটা বছর গেল। কিন্তু বদ্ নসিব যার, তার শান্তি কোথায়! ১৩১৪ সালে ৭ চৈত্র কাজী ফকির আহ্‌মদ মারা গেলেন। মসজিদের নিভৃত কোণে হয়তো কান্না গুমরে উঠছিল, হয়তো পীর পুকুরের ছোট্ট ঢেউভাঙা বুকে একটা শোকের ছায়া নেমে এসেছিল।

দুখু নাম এতদিনে সার্থক হলো। বিধবা মায়ের ছেলে। তাদের চারদিকে দুঃখের বর্ষা টিপ টিপ করে পড়ে চলেছে। আর পাঁচটা দামাল ছেলের সাথে গায়ে-মাথায় ধূলো মেখে দুপুর-সন্ধ্যায় দুখু ঘুরে বেড়ায়। দামাল ছেলে অভাবের ঘর হাসি দিয়ে ভরে দিতে পারে। কি বুদ্ধি তার—সবাই অবাক হয়ে যায়। যেখানে সেখানে পবিত্র ফুলের মতো হাসিতে ফেটে পড়ে।

গ্রামের মৌলবী। তাঁকে ভয় করে, ভক্তি করে লোকে, কিন্তু দুখুর সেদিকে খেয়াল নেই। সে পাগল, নিজের আনন্দে নিজে বিভোর। অল্পেই কত খুশী! আবার যখন জ্বলে ওঠে, সব ছাই হয়ে যাবার উপক্রম। তাই কাউকেই ভয় নেই। নিজের আনন্দে মত্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায় দুখু। কি সুন্দর দেখতে মৌলবী সাহেব! বড় বড় দাড়িতে শান্ত মূর্তি! উদাসী চোখে কি স্নিগ্ধ গভীর দৃষ্টি! দুখু অবাক হয়ে দেখে। উনি কি যেন বলেন সে অবাক হয়ে শোনে। কি সুন্দর ছন্দ, কি মিষ্টি সুর, কিন্তু কথাগুলোর অর্থ কি? দুখু বোঝে না, রুবাই কাকে বলে, বয়েৎ কাকে বলে সে জানে না।

www.phulkuri.org.bd

মৌলবী কাজী ফজলে আহ্‌মদ ভাবেন, এই ছেলেটি কে? ভারী মিষ্টি তো মুখখানা! দীর্ঘ চোখে কি সুন্দর চাহনী ধারালো ইস্পাতের মতো ঝক্‌মক্ করছে যেন! বেশ ধৈর্য নিয়ে বসে থাকে তো! কি সে শোনে! কি সে বোঝে!

—তোমার নাম কি?

—দুখু।

—তুমি এখানে বসে কি শোন?

—আপনি যা বলেন, তা' খুব ভাল লাগে।

—তাই নাকি! তুমি শিখবে এসব?

—শিখবো।

তারপর এক বৃদ্ধের আর এক শিশুর শুরু হল' সময় যাপন। কথায় কথায় কৌতূহল। কিসের জন্য যেন ছট্‌ফট্ করে তার অন্তর! আনন্দে বৃদ্ধের কোমল অন্তর ভরে ওঠে। তিনি শুরু করলেন তাকে আরবী আর ফারসী ভাষা শেখাতে। অতি অল্প সময়ে অনেক বেশি সে শিখে নিল। বিদেশী ভাষা সত্যি কি অদ্ভুত! যে শব্দগুলো কেবল শব্দ বলেই মনে হত একদিন তার কাছে, সেগুলো আজ অর্থময় হয়ে উঠলো! তারপর একদিন এলেন পশ্চিম থেকে একদল মৌলবী সাহেব কাজী ফজলে আহ্‌মদের কাছে। তাদের চোখে পড়লো এই ছেলেটি। শুনলেন তার পরিচয়। তারপর এক সন্ধ্যায় প্রদীপের মৃদু আলোয় বসে তাঁদের সুমুখে দুখু আবৃত্তি করলো কোরান শরীফ। মৌলবী সাহেবের মন পূর্ণ হয়ে এলো ভক্তিতে। কি অপূর্ব সুরেলা গলা! কি নিখুঁত তার উচ্চারণ! তাঁহারা জড়িয়ে ধরলেন দুখুকে। যেন এরই কোরান শরীফ পাঠ শুনবার জন্য তাঁরা এসেছিলেন। তাঁরা বলে গেলেন—এ ছেলের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

দুঃখীর ঘরের দুখু। ঘরে কতো অভাব! পেট পুরে আহার নিত্যদিন জোটে না। সে ছেলে স্কুলে পড়বে কেমন করে। ইচ্ছে থাকলেই সব কাজ হয় না। অত দুরন্ত দামাল ছেলে, সে বোঝে সে গরীব। বড়লোকে যা' পারে গরীবে তা' পারে না। তা'ছাড়া মা। মা যদি পয়সা দিতে না পেরে কাঁদে! মায়ের চোখে পানি সে সইবে কেমন করে! তাই বিষণ্ন চোখ মেলে দেখে,—একের পর এক ছেলেরা যায় মক্তবে। হাতে তদের কেতাব। তাদের সরস মুখগুলো কি সুন্দর দেখায়! দল

www.phulkuri.org.bd

বেঁধে গল্প করতে করতে গাছের ছায়াপথ দিয়ে তারা চলে যায়। দেখে আর মনের দুঃখ মনে চেপে দুখু চলে আসে ঘরে। নিজেই জোগাড় করে নেয় পুরনো বই। তারপর মেটে প্রদীপের তলায় বসে পড়ে। নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষা যেদিন দিল, সেদিন সবাই অবাক হয়ে গেল, ভালভাবে পাশ সে করেছে। মাত্র তো দশ বছর বয়সে! কিন্তু সংসার? অনেক কষ্টে ঐ সময়েই জোগাড় করলো পাঠশালার মাষ্টারী, এ গাঁয়ে সে গাঁয়ে মোল্লাগিরি, তা'ছাড়া পিতার ছেড়ে যাওয়া মসজিদের সেবা। কি পরিশ্রমই না করতে হয় তাকে! দুপুরের রোদে লাল হয়ে ওঠে কচি মুখ! কিন্তু সংসার? ঘরে দুঃখী মা। পৃথিবীর কঠিন মাটিতে শক্ত পায়ে হাঁটতে শিখলো একটি শিশু।

আশ্চর্য ছেলে এই দুখু! তার চাচা কাজী ফজল করিম। যিনি বাংলা, আরবী আর ফারসী বিশেষভাবে জানেন। তাঁর কাছ থেকে সেগুলো শিখতে হবে তাকে! তিনি একটু-আধটু কবিতাও লিখতে পারেন, তাই দুখুরও কবিতা লেখা চাই। তার মিষ্টি স্বভাবের জন্য চাচা তাকে খুব ভালবাসতেন। শুরু হ'ল কবিতা লেখা, আঁকাবাঁকা লাইনে কাঁচা কবিতা কে জানতো, এই আঁকাবাঁকা লাইনগুলো একদিন সমুদ্রের ঢেউ হয়ে উঠবে। এই কাঁচা কথাগুলি আগুনের ফুলকি হয়ে উঠবে। কেউ না। চুরুলিয়ায় তো আরও দু'একজন পল্লীকবি ছিলেন। কই তাঁরা তো পারেন নি।

চুরুলিয়ার এই কবিরা ভালোবাসতেন এই বালক কবিকে। তাঁরা দিতেন এই ছোট্ট ছেলেটিকে অফুরন্ত স্নেহ আর প্রীতি। মিষ্টি গলায় ছেলেটি গান গাইতে পারে, সমগ্র মন আর শরীর দিয়ে যে হাসতে পারে, যার আনন্দ ছোট বড় সকলের হৃদয় জয় করতে পারে, তাকে ভাল না বেসে পারা যায় কি? তারপর সবাই তখন জানলো যে, দুখু পদ্যও লিখতে পারে, গানও বাঁধতে পারে, তখন তো আর কথাই নেই। তাদের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়লো তার গুণের কথা। সবাই অবাক। তারা তাকে দিল কবি জীবনের প্রথম সম্মান, প্রথম পুরস্কার। তার কবিতা তাদের ভাল লাগে বলে। পাঠকের ভাল লাগাই তো কাব্যের সার্থকতা। এদেরই উৎসাহে লিখে যেতে লাগলো দুখু। একটার পর একটা কবিতা আর গান।

পল্লী কবিদের মধ্যে যে সবচেয়ে ভাল, তাকে বলত 'গোদাকবি'। দুখুর প্রশংসায় সেই গোদাকবির রাগ হবার কথা, সকলের সংগে নিজেও গলা মিলিয়ে সে-ও দুখুর প্রশংসা করতে শুরু করলো। এমন লেখা আর হয় না! ভবিষ্যতে সে খুব নাম-ডাকওয়ালা কবি আর গাইয়ে হবে। আদর করে দুখুকে সে বলতো 'ব্যাঙাচি'। মাঝে মাঝে সে বলতো—এ ব্যাঙাচি একদিন গোখরো সাপ হবে।

www.phulkuri.org.bd

তখনকার দিনে রঙিন জামা-কাপড় পরে টিনের তলোয়ার ঘুরিয়ে হত যাত্রা। খোল-করতাল বাজিয়ে হত পালা গান, হত কবি গান। তাই শুনতে কত দূর-দূরান্তর থেকে লোকেরা আসতো। ছেলে কোলে নিয়ে রান্নার পাট তুলে আসতো বৌ-ঝিরা। সেই সময় আর একটা জিনিস ছিল এমনি প্রিয়, সে হলো লেটো গান। খানিকটা কবিগানের মতো। হাসির গল্প-ছড়া বা কোন কাহিনীকে নাচগান দিয়ে যাত্রার মতো করে তুলতো গাইয়েরা। মেলা-পূজো পার্বণে হত এই লেটো গান। এমণিতেও হত। গ্রামের লোকেরা খুব ভালবাসতো এই লেটো গান। প্রায় অনেক গ্রামেই এই লেটো গানের দল গড়ে উঠেছিলো তখনকার দিনে। যারা একটু গান বাঁধতে আর গাইতে পারতো, তারাই এই লেটোর দল গড়ে তুলতো।

কতই বা বয়স তখন—এগারো কি বারো! এই বয়সেই হাসির ছড়া আর কবিতা লিখে দু-পাঁচ গায়ে বেশ নাম করে ফেলেছে দুখু। দু-একটা নাটকও লিখে ফেলেছে। সবাই তখন ঐটুকু ছেলেকে ডাকতে আরম্ভ করলো দুখু মিয়া। সে যেন হয়ে উঠলো সকলের সেরা কবি। সকলেই অবাক হয়ে যায়, মুগ্ধ হয়ে যায়—ঐটুকু ছেলে এসব লিখলো কেমন করে!

আবার সংসার! মা আর ছোটো ছোটো ভাই-বোন। তাদের দিন চলে কি করে! সেই তো এখন বড়ো ছেলে। হোক্ না বয়সে অল্প বড় ছেলেতো বটে, দায়িত্ব তো একটা আছে! রোজগার করতে হবে। ভেবে পায় না, কয়েকটা পয়সা কি করে রোজগার হবে। অবশেষে ঠিক করলো যোগ দেবে লেটো দলে। দিলেও তাই। দুখর মতো একজনকে পেয়ে দলের নাম বেড়ে গেল খুব! যারা দেখতে আসতো, তারা সবাই অবাক হয়ে দেখতে লাগলো, একটি বালক কবির কি রূপ, কি অভিনয়-ক্ষমতা আর কণ্ঠস্বর! এমনি করে সে হল দলপতি—ওস্তাদ। লেটো দলের ওস্তাদ বিচিত্র জীবন।

নিজে গান-ছড়া লিখে, তাতে সুর দিয়ে আসরে দাঁড়িয়ে যেদিন প্রথম গাইলো দুখু, সেদিন সবাই ভেঙে পড়েছিল আসরে। অবাক কাণ্ড, দুখু মিয়া আবার আসর জমাতেও পারে। জ্বলজ্বলে টানা-টানা চোখ, উড়ু উড়ু লম্বা চুলে দুখু তখন নতুন মানুষ। এমনি করে গেল দিনের পর দিন।

চার বছর পার হয় হয় এমন সময়ে জন্ম-বিরাগী দুখুর মন তখন আর এই সামান্য লেটো গানের দলে থাকতে চাইলো না। তার মনে তখন নতুন নেশা—খাম-খেয়ালী মন, সে কি কারো পরোয়া করে?

www.phulkuri.org.bd

বিস্বাদ হয়ে এলো গানের দল, পুরোন বন্ধু! কি হবে নাম দিয়ে? পাঁচজনে বলে—দুখু বড় ওস্তাদ হয়েছে! তাতে কি এমন! এ ক'দিনের মনে ভাবলো কি করা যায়। আচ্ছা পড়াশুনা করলে কেমন হয়! আবার ঠিক, আবার পড়াশুনা শুরু করবে দুখু। ছেড়ে দিল দল, কিন্তু লেটোর দল তাকে ভুলবে কেমন করে? তাদের সুরে কথায় যে তাদের ওস্তাদের মায়া জড়ানো রয়েছে। তাইতো রাঙা মাটির মানুষগুলোর মনে ওস্তাদের ছায়া সুবজ-সরস হয়ে রয়েছে! তাইতো ওরা ওস্তাদহীন আসরেও গায়—

'আমরা এই অধীন, হয়েছি ওস্তাদহীন
ভাবি তাই নিশিদিন বিষাদ মনে।'...
নামেতে নজরুল ইসলাম—কি দিব গুণের প্রমাণ।

সেদিনের যে ওস্তাদকে তারা ভুলতে পারেনি, তারা যদি জানতো যে, সমস্ত বাংলাদেশ সেই ওস্তাদকে কোনদিন ভুলবে না, তবে সেদিন তাদের আনন্দকে তারা রাখবার জায়গা খুঁজে পেতো না। তবু আজ ভালো লাগে এই ভেবে যে, কাজ যাকে সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে আমরা ভালবেসেছি, একদিন মাত্র কয়েকজন গ্রাম্যলোক ঠিক সেইরকম হৃদয় দিয়েই তাকে ভালবেসেছিল!

শুরু হলো নতুন করে একটু একটু লেখাপড়া। সেই সঙ্গে শুরু হলো নতুন কবিতা লেখা। লিখলো কাব্য-কাহিনী "চাষীর সং" লিখলো "রাজপুত্র", "শকুনীবধ"। কিন্তু সে যে পাগল! কোনো জিনিস কি তখন গুছিয়ে রাখার অভ্যেস ছিল তার! পাখি মনের আনন্দে গান গায়! কেউ শুনুক আর না-ই শুনুক! দুখুও মনের টানে কবিতা লেখে। লেখা হলেই হলো। এমনি করে প্রথম বয়েসের কত কবিতা আর গান হারিয়ে গেছে তার ঠিক নেই! ছোট্ট বয়সেই কি সুন্দর কবিতা লিখতো, তা' দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়—

"রবো না কৈলাশপুরে
আই অ্যাম ক্যালকাটা গোয়িং—
যত সব ইংলিশ ফ্যাসান,
আহা মরি কি লাইটনিং!
ইংলিশ ফ্যাসান সবই তার,
মরি কি সুন্দর বাহার—

www.phulkuri.org.bd

দেখলে বন্ধু দেয় চেয়ার,
কাম অন ডিয়ার গুড্ মর্নিং।
বন্ধু আসিলে পরে—
হাসিয়া হ্যাণ্ডসেফ করে,
বসায় তারে রেসপেক্ট করে
হোলডিং আউট এ মিটিং।
তারপরে বন্ধু মিলে,
ড্রিংকিং হয় কৌতূহলে—
খেয়েছে সব জাতিকুলে
নজরুল ইসলাম ইজ টেলিং ॥”

কি অপূর্ব ব্যঙ্গ নৈপুণ্য! অপর একটি কবিতা।

চাষ কর দেহ জমিতে
হবে নানা ফসল এতে
নামাজে জমি উগালে
রোজাতে জমি সামলে,
কলেমায়ে জমিতে মই দিলে
চিন্তা কিহে এই ভবেতে! (চাষীর সং)

বড় দুরন্ত, বড় দামাল হয়ে উঠলো দুখু। প্রতিবেশীর বাগানের ফুল চুরি যায়, ফল যায় আর পুকুরের মাছও যায়। সবার মুখেই গেল গেল রব। কাঁহাতক আর সহ্য করা যায়!

হোক্ না কবি-ছেলে, আসর জমানো গায়ক-ছেলে তবু সব কিছুই কি তার সহ্য করা যায়? সঙ্গে জুটেছেও তেমনি এক দল! সব তছনছ করে দিচ্ছে। কিন্তু কি আর বলা যায় বাপ-মরা পাগল ছেলেটাকে! শত হলেও দুখু মিয়ার নামে পাঁচটা গাঁয়ের লোক মাথা নাড়ে।

গায়ের লোক ঠিক করলো; লেখাপড়ার গরজ যখন আবার হয়েছে দাও ওকে স্কুলে ভর্তি করে। দিলও তাই। রাণীগঞ্জের কাছে “সিয়ারসোল রাজ স্কুলে” ভর্তি হলো দুখু মিয়া।

www.phulkuri.org.bd

পীর পুকুরের ধারে ভাঙা মসজিদের ছায়া ছেড়ে চেনা মুখের ভালবাসা ছেড়ে দুখু গেলো কোন কালো পাথুরে দেশে! দুখু হলো পরদেশী! আহা রে চুরুলিয়া গ্রাম, দুখুর জন্য বুঝি তারও মায়া হলো!

পাথুরে দেশে এসে হাঁপিয়ে উঠলো দুখু। কই সেই ছায়া ঢাকা ছোট্ট ঢেউ-জাগা পুকুর, কোথায় সেই গ্রাম! এখানে তার আর মন বসে না! ছেড়ে দিল ঐ স্কুল। ভর্তি হলো গিয়ে নতুন আরেক স্কুলে। মাথরুল বিদ্যালয়ে। কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক তখন ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক। এক কবির ছায়ায় আর এক কবি তার আসন পেতে বসল। কিন্তু মন বসলো না সেখানেও। মাত্র ক্লাস সেভেনের ছেলে! পালালো স্কুল থেকে। তখন ১৩১৭ সাল। কিন্তু অচেনা অজানা জায়গা, যাবে কোথায়? ভাবতে ভাবতে এসে হাজির হল আসানসোল শহরে। কোথায় বা আত্মীয়-স্বজন! কোথায় বা আশ্রয়! হাতে পয়সা নেই, খাবার সঙ্গতি নেই। কি করে? পেটের মধ্যে কতকগুলো রাক্ষস হা-হা করছে! চাকরি করতে হবে যে করেই হোক। চাকরি পেল বহু কষ্টে এক রুটিওয়ালার দোকানে। মাস গেলে পাঁচ টাকা মাইনে। ময়দা মেখে রুটি তৈরি করে সারাদিন। হায়রে কবি, হায়রে পীর পুকুরের গ্রামের লেটো দলের সর্দার, সে হলো কিনা আজ এক রুটিওয়ালার গোলাম!

কিন্তু হঠাৎ একটা পরিবর্তন এলো তার জীবন। স্কুল পালানো ছেলে হল বইয়ের পোকা। হাড়ভাঙা খাটুনীর পর রাত্রে যখন দু'চোখ জড়িয়ে ঘুম আসে তখন মোমবাতি জ্বেলে ধর্মের পুঁথি নিয়ে পড়তে বসে দুখু। পড়ে উর্দু, পড়ে ফারসী। এমনি করে রাত্রির পর রাত্রি চলল তার নীরব সাধনা!

কাজের ফাঁকে ফাঁকে সুর জেগে ওঠে জন্ম-গায়ক সুর পাগলের মনে। সেই লেটো দল, গান, আসর, মনে পড়ে সবই।

হঠাৎ দুখু মিয়ার আলাপ হয়ে গেল আসানসোলের পুলিশ ইন্সপেক্টর রফিকউদ্দীন সাহেবের সাথে। উনি সামান্য এই ছেলেটার মধ্যে আগুনের তাপ টের পেলেন। তিনি ভাবলেন, এইভাবে নষ্ট হয়ে যাবে একটা প্রতিভা! হয় তো একটু সুযোগ পেলেই দাঁড়িয়ে যাবে ছেলেটা।

তাই তিনি নিজের দেশ ময়নসিংহে নিয়ে গেলেন দুখুকে। নিজের বাড়িতেই রেখে ভর্তি করে দিলেন দরিরামপুর স্কুলে।

গাঁয়ের লোকে এমন একটা চৌকোশ ছেলে পেয়ে খুশীতে আটখানা। সকলেই ভালবাসলো। এমনটি আর হয় না। বাড়ির লোকে তো হাতে চাঁদ পেলো।

www.phulkuri.org.bd

একে তো গান বাঁধতে পারে, তার দরাজ গলা, দেখতেও সুন্দর! শান্ত ছেলেটি স্কুলে যায়, আবার ফিরে আসে। সবদিকে এমন ভাল হাজারে একটাও মেলে না।

কিন্তু ক'দিন? স্বভাব! স্বভাব তো আর যাবার নয়! ঘূর্ণি হাওয়ার খ্যাপামি যাবে কোথায়? খেয়ে দেয়ে স্কুলে যায়, সময় মতো ফিরেও আসে। কিন্তু বই থাকতো কোথায়? বটগাছের কোটরে! দুখু থাকতো কোথায়? মাঠে! চাষীদের সাথে আলের উপরে বসে দুপুর রোদে শুরু করতো গল্প। তারপর আবার বটতলায় শুয়ে শুয়ে শুরু করতো গান। দুপুরে মাঠের রোদে তপ্ত বাতাস ঝিরঝির করতে ওই গানের সুরে। ভুলে যেত সব কিছু! তারপর আকাশের সিঁড়ি বেয়ে দিনের সূর্য যখন পাটে নামাতো, তখন গাছ থেকে খুঁজে-পেতে বই-পত্তর নিয়ে দুখু ফিরতো বাড়ি। কি শান্ত সুবোধ ছেলে! এমনিতে বেশ আরামেই দিন কাটতে লাগলো।

ঘনিয়ে এলো বার্ষিক পরীক্ষা। সর্বনাশ! কিন্তু পরীক্ষা না দিলে তো চলবে না! সব যে ধরা পড়ে যাবে! তাই পরীক্ষার শেষ ঘন্টা যখন পড়লো তখন প্রশ্নপত্র ভাঁজ করে সবার সঙ্গে দুখুও এলো বেরিয়ে। সময় হলো ফল বেরুবার।

বেরুলো ফলাফল। সবার নাম ডাকে। কিন্তু দুখুর নামটা ভুলেও একবার ডাকলো না মাষ্টার মশাই! ডাকবে কি, দুখুতো জানে খাতায় সে কি লিখে এসেছে। প্রায় সব বিষয়েই পেল গোল্লা। কিন্ত সবাই অবাক হলো বাংলা খাতা দেখে। অবাক কাণ্ড! সবচেয়ে বেশি নম্বর কিনা বাংলায়! নিশ্চয় টুকেছে! মাষ্টার মশাই আবার পরীক্ষা নিলেন। কিন্তু আশ্চার্য! আগাগোড়া খাতায় কবিতা লেখা। সবাই অবাক হয়ে যায় তার প্রতিভা দেখে। কিন্তু কি আর করা যায়। প্রোমশন তো আর হতে পারে না! বাংলায় ভাল হলে কি হবে! অন্য সব বিষয়ে তো একেবারে দিগগজ পণ্ডিত। অনেক চেষ্টাতেও আর পড়াশুনায় মন বসলো না দুখুর। মাঝে মাঝে মনে হয় সেই ছোটো দলের কথা। বেশ আনন্দে থাকা যাচ্ছিল! আচ্ছা, আবার লেটো দলে ফিরে গেলে কেমন হয়? কবিতা, গল্প, নাটক, গান সব লেখা যাবে! তারপর সুর দিয়ে আসরে গাওয়া বেশ হয়! গান গাওয়াও চলে, আবার পয়সাও রোজগার হয়। সত্যিই তো—মন্দ কি?

মন যার চঞ্চল বাঁধনহারা, তার কি একঘেঁয়েমি ভাল লাগে। তাই দেশে ফিরলো সে। কিছুদিন আবার লেটো গান গাওয়ার পর ১৯২০ সনে আবার ছেড়ে দিল সব। ভর্তি হোল অষ্টম শ্রেণীতে। আবার সেই পুরোন সিয়ারসোল রাজ স্কুলে।

www.phulkuri.org.bd

সব ছাত্রই নতুন। কিন্তু ওরই মধ্যে একজনের সঙ্গে কেমন বন্ধুত্ব হয়ে গেল। ছেলেটা শুধু কবিতা লেখে। তার নাম শৈলজা। কথা সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। দু'জনের বন্ধুত্ব দেখতে দেখতে গভীর হয়ে উঠলো। আর সেই সঙ্গে লেখাপড়ার ওপর একটা অসীম টান এলো। দুই বন্ধুতে মিলে চলল সরস্বতী-সাধনা। ম্যাট্রিক পরীক্ষা এসে গেল। ক'দিন বাদে প্রিটেস্ট। পড়াশুনা চলছে পুরোদমে। মাঝে মাঝে দরিদ্র সংসারের কথা মনে পড়ে। কিন্তু উপায় কি!

এমন সময় আকাশে বাতাসে প্রথম মহাযুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো। ধ্বংসের কালো মেঘ ঘনিয়ে এলো আকাশে। কবি সর্বনাশের নেশায় মেতে উঠলো। চোখের কোণে নেচে উঠলো কাল বৈশাখী। যুদ্ধে গেলে নাকি ভাল টাকা পাওয়া যায়! তবে তো মায়ের দুঃখের সংসারে একটু হাসি ফোটানো যায়! ফৌজী পোশাকের নিচে ছল-ছল করে উঠল বন্যার মতো রক্তস্রোতে। চুরুলিয়ার দুখু কাঁধে নিল রাইফেল, কড়া পোশাক, শক্ত বুক। ১৯২০ সালে ৪৯নং বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগ দিলো দুখু। পাড়ি দিল দূর দেশে! ঘামে ভিজে উঠলো শরীর। পায়ে-পায়ে এগিয়ে চলল রেজিমেন্ট। কোথায় করাচী, সেখানে পড়ল তাঁবু। চারদিকে অস্ত্রশস্ত্র। নিয়মের শৃঙ্খল। এর মধ্যে মনে পড়ে নিস্তব্ধ দুপুরের ঘুঘু-ডাকা সেই চুরুলিয়া গ্রাম।

—০—

সৈনিক জীবন

কঠিন মাটিতে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে এক নওজোয়ান—সঙীনের ইস্পাত রোদ্দুরে ঝল্সাচ্ছে। কে চলছে দুর্গম পথের দুঃসাহসী পথিক? কে এই নওজোয়ান?

সঙীনের মুখ দিয়ে ইতিহাসের পাতায় যে নাম লেখা হলো রক্তের অক্ষরে, সমস্ত আকাশ সে নামটির অপেক্ষায় ছিল এতদিন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে যে নামটি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো বাংলার আকাশে। সুদূর উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে উল্কার মতো ছুটে এলো সেই নাম বাংলার সজল পলিমাটির বুকে, সে নাম—হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম।

ভেতরে যার আগুন—সে মশাল জ্বলে উঠবে সব জায়গাতেই। তাই সাধারণ সৈনিক নজরুল নিজের যোগ্যতায় একদিন হলো হাবিলদার। এর অল্পদিন বাদেই হলো রসদ ভাণ্ডারের তদ্বিরকারক। সেনাদলের মধ্যে তিনি ছিলেন খুব জনপ্রিয়। করাচী সেনা নিবাসে তাঁর সাথে আলাপ হলো এক পাঞ্জাবী মৌলবীর। অবসর সময়ে সৈনিকের কড়া পোশাকের ভেতর হতে বেরিয়ে আসতো দুই কবিপ্রাণ। তারপর কাজী আর মৌলবীতে শুরু হত কাব্য-চর্চা। মৌলবীর কাছে তিনি পড়তেন পারস্য কবিদের কাব্যগ্রন্থ। সেখানেই তিনি দীওয়ান-ই-হাফিজের বাংলাতে অনুবাদ করেন। চণ্ডী, রামায়ণ, মহাভারত, বেদ উপনিষদও ঐ সময়ে তিনি পড়েছিলেন।

করাচীর শিবিরে রাইফেলের পাশে কবিতা লিখলেন কত! লিখলেন গল্প। তারপর সেই কবিতা আর গল্প উল্কার মতো এলো বাংলাদেশে।

১৩২৬ সন। বাংলায় সেবার ঝড় আর বন্যা—বাংলার আকাশে সেই সময়ে বিদ্রোহী কবির আবির্ভাব! জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা "সওগাতে" তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়। সেই বছরই 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য' পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় "মুক্তি" নামক কবিতা প্রকাশিত হয়। এটাই তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা—

“রাণীগঞ্জের অর্জ্জুন পটির বাঁকে
সেখান দিয়ে নিতুই সাঁঝে ঝাঁকে ঝাঁকে
রাজার বাধে জল নিতে যায় শহুরে-বৌ কলস কাঁখে।
সেই সে বাঁকের শেষে,
তিনদিক হতে তিনটা রাস্তা এসে
ত্রিবেণীর ত্রিধারার মত গেছে একেই মিশে
তে-পথার সেই দেখাশুনোর স্থলে—
বিরাট একটি নিমগাছের তলে,
জট্‌ওয়ালা সন্ন্যাসীদের জটলা বাঁধতো সেথা;
গাজার ধুঁয়ায় পথের লোকের আঁতে হতো বেথা”—ইত্যাদি।

এরপর থেকেই চলল একের পর এক লেখা। তিনি নামের আগে সেই সময়ে লিখতেন ‘হাবিলদার’। হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম। ‘মোসলেম ভারতের’ পরিচালক মুজফ্‌ফর আহমদ অবাক হয়েছিলেন একটি সৈনিকের কাব্য প্রতিভা দেখে। যুদ্ধ প্রান্তর থেকে কারো পক্ষে যে এমন কবিতা লেখা সম্ভব, তা যেন ধারণাই করা যায় না। রাইফেলে টোটা পুরতে পুরতে যে কবিতা লেখা যায় তা এই কবিই দেখালেন। চাঁদের দিকে হাঁ-করে চেয়ে থাকতেও হয় না, বা অন্যকিছুও করতে হয় না। আপনার স্বভাবের নিয়মেই তা লেখা হলো। গুণমুগ্ধ মুজফ্‌ফর আহমদ তো করাচীর সৈন্য-শিবিরে চিঠি লিখে বসলেন। এই থেকেই দু’জনের মধ্যে ভালবাসা জন্মালো।

সেই সময়ে ‘সবুজপত্র’ পত্রিকাখানি খুব নামকরা। প্রমথ চৌধুরী ‘বীরবল’ ছদ্মনামে তার সম্পাদক। নজরুল একটা কবিতা সবুজপত্রে’ পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু সম্পাদকের তা মনোনীত হল না। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় তখন সবুজপত্রে কাজ করেন। কবিতাটি তাঁর খুব ভাল লাগল। তিনি ভাবলেন, অন্য কোন কাগজে দিয়ে দেবার কথা। তাই তিনি কবিতাটি নিয়ে সটান চলে গেলেন ‘প্রবাসী’ অফিসে। চারু বন্দোপাধ্যায় ‘প্রবাসীর’ সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করতেন। তিনি ‘প্রবাসী’তে ছাপলেন সেটা। সেটা ছিল ১৩২৬ সালের পৌষ সংখ্যা। কিন্তু তখন কবির সাথে পবিত্র বাবুর আলাপ-পরিচয় হয়নি। অথচ পবিত্রবাবু ভালো লেখার ও নতুন লেখকের মর্যাদা দিতে কোনদিন দ্বিধা করেননি। এই সূত্রেই দু’জনের পরিচয় হলো

এবং পরে অতিশয় বন্ধুত্ব হলো। এদিকে নজরুলের কবিতা তখন এখানে-ওখানে একটা-দুটো করে বের হচ্ছে। কবির কি আনন্দ! একদিকে রাইফেল, অন্যদিকে কলম। একদিকে প্যারেডের তাল, অন্যদিকে গানের সুর। ফৌজী জীবনের ফাঁকে ফাঁকে কাব্যের মধু জমে উঠতে লাগল। একদিকে আগ্নেয়গিরি, অন্যদিকে ফুলের গুচ্ছ ফুল। এই দ্বৈত জীবনের টানা-পোড়নে কবির এক নতুন জীবন গড়ে উঠলো।

এমনি করে দু'বছর কেটে গেল। প্রথম মহাযুদ্ধের সমাপ্তি হলো। সৈন্যদল ফিলে গেল যে যার দেশে। ভেঙ্গে গেল চাকরি জীবন। ৪৯নং বেঙ্গল রেজিমেন্টও ভেঙ্গে গেল। দারুণ অন্ন-সমস্যার মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন কবি। কোথায় চাকরি, যুদ্ধ ফেরৎ কবির চাকরি কোথায় জুটে! ধরাবাঁধা আয় বন্ধ। সংসারের চাকা আস্তে আস্তে অচল হয়ে এলো। এমন সময় বর্ধমানে একটা সাবরেজিষ্ট্রারের চাকরি পাওয়া গেল। খবর পেলেন মুজফ্ফর আহমদ। বললেন,—পরাধীন দেশে সরকারী চাকরি নেবে?

না না—অসম্ভব, ইংরেজের গোলামী আর নয়। এমন সমস বন্ধু-বান্ধবদের অনুরোধ এলো,—চলে এসো রাজধানীতে। বৈচিত্র বিলাসী কবি চলে এলেন কলকাতায়। যাদের জানতেন নামে—দাঁড়ালেন এসে তাদের মুখোমুখি। এক নতুন জগতে এলেন কবি। নতুন প্রাণের আসরে নজরুল উদ্দাম হয়ে উঠলেন সমুদ্রের জোয়ারের মত। কলেজ ষ্ট্রীট। তারই ওপর একটি ঘরে বসলো আসর। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, মুজফ্ফর আহমদ, মোজাম্মেল হক, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, হেমেন্দ্রলাল রায়, শাহাদাত হোসেন প্রভৃতি এসে জুটতেন। সাহিত্যের আসরে তাঁরা সকলেই আজ সুপ্রতিষ্ঠিত।

তারপর এল ১৩২৮ সাল। 'মোসলেম ভারত' কার্তিক সংখ্যা যেন একটা ভূমিকম্প নিয়ে এলো। নিয়ে এলো দুটো কবিতা। "বিদ্রোহী" আর "কামাল পাশা"—লিখেছেন বিপ্লবী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। সমগ্র দেশ থর্ থর্ করে কেঁপে উঠলো। মানুষের বুকের মধ্যে নতুন রক্তস্রোত ছল্‌ছল্ করে উঠলো! শান্ত চিত্তে হঠাৎ যেন চাঞ্চল্যের সাড়া এলো। সমস্ত দেশটা মোচড় খেয়ে উঠলো।

বল বীর
চির উন্নত মম শির।

অল্প ক'দিনে শেষ হয়ে গেল 'মোসলেম ভারত।' অন্য পত্রিকারা তখন কবিতা দুটো নিজেদের কাগজে পুনঃ প্রকাশ করলো। পরাধীন জাতি যেন জেগে উঠলো। কবির কণ্ঠে শুনলো, নিজেদের জাগরনী গান। হু-হু করে বিক্রি হয়ে গেল সমস্ত

www.pathagar.org.bd

পত্রিকা। সকলের মুখে মুখে 'বিদ্রোহীর' ছত্র। একটা জাতি যেন নতুন ভাষা পেয়েছে। জাতটা নতুন করে বুক ফুলিয়ে বলতে শিখলো—

"করি শত্রুর সাথে গলাগলি,
ধরি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা।"

আজ বিদ্রোহী কবি বললে নজরুলকেই মনে পড়ে।

একজন পণ্ডিত ব্যক্তি বলেছিলেন, "প্রতিভা যাহাকে স্পর্শ করে তাহাকেই সজীব করিয়া তোলে।" রবীন্দ্রনাথকে দেখে সে কথা বুঝতে পারা যায়। কিন্তু নজরুলকে দেখে মনে হয় একটা কথা যে, প্রতিভা যাকে স্পর্শ করে, তাকেই জ্বলন্ত করে তোলে। তাই নজরুল যখন এ, কে, ফজলুল হকের 'নবযুগ' পত্রিকা সম্পাদনার ভার পেলেন ১৯২০ খৃঃ অব্দে, তখন সেই প্রতিভার জ্বালা ইংরেজ সরকারকে বেশ কিছু জ্বালিয়ে তুলেছিল। প্রথম সাংবাদিক-জীবনে বিদ্রোহী কবি তাঁর পত্রিকার মাধ্যমে দেশের অবহেলিত জনসাধারণের অন্ধ পর্দাটা ছিঁড়ে ফেল্‌তে চাইলেন। আন্দোলনের সর্বপ্রধান হাতিয়ার হলো পত্রিকা। সেই হাতিয়ারকে তীব্র আলোময় ও ধারালো করে তুললেন তিনি। একটা ঘুমন্ত জাতি যেন চম্‌কে জেগে উঠলো! অগ্নিকোণে যে ঝড়ের মেঘ জমে উঠতে লাগলো। বিদ্যুতের হল্কা জল্‌সে উঠলো মানুষের মনগুলোতে।

এই ঝড়—এই বিজলীর ঝল্‌কানি সাগর-পাড়ে জাগালো সাড়া। বিদেশী শাসকের ক্রোধের উত্তাপ ফেটে পড়লো দেশের ওপরে আর তার লক্ষ্য হয়ে উঠলো কাজী নজরুল। তীক্ষ্ণ সম্পাদকীয় মন্তব্যের ধারে অতিষ্ঠ ইংরেজ রাজ বাজেয়াপ্ত করে দিলো তাঁর নবযুগের হাজার টাকা জামিন। বন্ধ হয়ে গেল নবযুগ। কাজীর সমস্ত প্রবন্ধগুলো "যুগবাণী" নামে বই হয়ে বেরোলো। প্রতিটি ছত্র যেন আগুন দিয়ে ছাপা। সহ্য হলো না বৃটিশ সরকারের। বাজেয়াপ্ত করে দিল সমস্ত বই। সুভাষ বোসের জন্মদিনের পালন করা হবে। স্ফুলিঙ্গটির উত্তাপ সেদিন দেশ টের পেয়েছিল। আর ক্ষেপে উঠেছিল। তারা, ন্যায্য দাবির কথা শুনলেই ক্ষেপে ওঠা একদিন যাদের স্বভাব ছিলো।

জন্মদিন তো হবে। কিন্তু সভাপতি হবে কে? সভাপতি হওয়ার মানেই সাদা মানুষের নীল চোখকে লাল করে তোলা। হঠাৎ মনে পড়লো একজনের নাম। রক্ত চক্ষুর সামনে, চাবুকের সামনে মেরুদণ্ড সিধে করে যে দাঁড়াতে পারে সে নজরুল।

www.pboighar.org.bd

কামানের গর্জনের সামনে যে গান গায়, সে কি ভয় করে সাদা চামড়ার তুচ্ছ মানুষগুলোকে!

যার কবিতায় শিকল ভাঙার গান।

যে বলতে পারে—

'আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল,
আমি দলে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম-কানুন শৃঙ্খল!
আমি মানি নাকো আইন—
আমি ভরা তরী করি ভরা ডুবি,
আমি টর্পেডো, আমি ভীম-ভাসমান মাইন!'

এই আইন-ভাঙা দুঃসাহসী বিদ্রোহী ছাড়া আর কে সভাপতি হতে পারে আর এক বিপ্লবীর জন্ম-সভায়!

সেদিনের সভা। ফুলের মালা গলায় দিয়ে বসে আছেন সেদিনের সুভাষ বোস। নজরুল ছিলো-ছেঁড়া ধুনকের মতো দাঁড়িয়ে যথাযোগ্য মর্যাদা দিলেন সেদিনের নেতাজীকে।

১৯২০ সাল। কংগ্রেস অধিবেশনে অর্ধনগ্ন ফকিরের অসহযোগের আহ্বান ছড়িয়ে পড়লো সারা দেশে। একটা নতুন আবেগের ঢেউ এসে ভেঙে পড়লো দিকে দিকে। নতুন আদর্শে জেগে উঠলো দেশ। মহাত্মা গান্ধীর সেই অসহযোগের পথে আশার বাণী বয়ে নিয়ে এলো নজরুলের কবিতা—

এবার মহানিশার শেষে ...
আসবে উষা অরুণ হেসে, করুণ বেশে।
আলো তার ভরবে এবার ঘর
তোরা সব জয়ধ্বনি কর,
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!'

১৯২১-এর নভেম্বর। ইংলণ্ডের প্রিন্স অব ওয়েলস্ এলেন ভারত সফরে। স্বাধীনতা আন্দোলন তখন সারা ভারতে।

জাতীয় কংগ্রেস ঘোষণা করলেন হরতাল।

দেশের সকল প্রদেশে ছড়িয়ে পড়লো এই আওয়াজ।

www.phulkuri.org.bd

তৈরি হলো প্রতিবাদ মিছিল। কাজীর কাছে অনুরোধ এলো লিখে দাও মিছিলের গান।

কাজীর কলম তো শ্রান্তিহীন।
লেখা হলো গান।
সুরও দেয়া হ'ল তাতে।

তারপর কুমিল্লার পথে লক্ষ জনতার পায়ে পা মিলিয়ে হারমোনিয়াম গলায় ঝুলিয়ে, তাদের আগে চললেন কাজী। একটা দাবানলের মত। সেই চুরুলিয়া পীর পুকুরের ছোট ছেলে, আজ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

অসহযোগ আন্দোলন একটা প্রচণ্ড গতিতে দেশে ছড়িয়ে পড়ছে সুদূর পাঞ্জাব থেকে আসাম—কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত। নতুন অহিংস আন্দোলনে দিশেহারা ইংরেজ একের পর এক করে কারা-প্রাচীরের অন্তরালে ঠেলে দিল নেতাদের। শৃঙ্খলিত হলো নবজাগ্রত জনতার প্রতিনিধিরা। অত্যাচারীর শাসনের সামনে চির-অশান্ত বিদ্রোহী কবি গাইলেন :

'জাগেন সত্য ভগবান যে রে
আমাদেরি এই বক্ষমাঝে!
আল্লাহ্‌র গলে কে দিবে শিকল,
দেখে নিব মোরা তাহাই আজ!'

এই সময় মহাত্মার কাছ থেকে স্বাবলম্বনের নির্দেশ এলো। এলো দেশী পণ্য গ্রহণের আবেদন। করো বিদেশী বর্জন। সেই সঙ্গে এলো চরকা আন্দোলন। ঘরে ঘরে গড়ে উঠুক চরকা, এই বিদেশী বর্জনের সাথে সাথে চরকার গান গাইলেন কবি।

ইংরেজ বণিকের স্বার্থ এতে আহত হল। পাগল হয়ে উঠল তারা নিদারুণ ক্ষতিতে। একের পর একজন নেতা, আর তার সাথে অহিংস জনতা দিন কাটাতে লাগলো লৌহ-কপাটের অন্তরালে। চললো নির্দয় পীড়ন। যে পাশবিক পীড়নের কাছে সভ্য সমাজের মাথা নিচু হয়ে আসে। সহ্য করতে পারলেন না বিদ্রোহী কবি। বুঝলেন, বিপ্লব ছাড়া পথ নেই। ঘরে বসে তাঁত বুনে চরকা ঘুরিয়ে স্বাধীনতা আসে না। আলস্যের মূল্য যথেষ্ট নয়। রক্তের মূল্য দিতে হবে। তাই এবার গাইলেন—

www.pbulkuri.org.bd

'সূতো দিয়ে মোরা স্বাধীনতা চাই
বসে বসে কাল গুণি!
জাগরে জোয়ান, বাত ধরে গেল
মিথ্যা তাঁত বুনি!'

কিন্তু এই কবিতা তিনি তাঁর আন্দোলনকে কতটা জোরদার করতে পারবেন! যত কথা বলতে চান, তত বলার স্থান কোথায়! তাই আবার মনে হল মুক্তি-আন্দোলনের অন্যতম হাতিয়ার পত্রিকার কথা। যে পত্রিকায় জনগণ তাদের ভাষা পাবে।

তারপর ১৩২৯-এ কলকাতা থেকে বের হল সাপ্তাহিক "ধূমকেতু"। সম্পাদক কাজী নজরুল ইসলাম।

ধূমকেতু প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে লোকের মনে বিশ্বাসের বুনিয়াত দৃঢ় হয়ে উঠলো! তাদের আশ্রয় আছে, তাদের ভাষা আছে আর আছে ক্ষোভের দাহ। রবীন্দ্রনাথ দেখলেন নতুন যৌবনের পদক্ষেপ, নতুন শক্তি কাজীকে তিনি অভিনন্দন পাঠালেন—

"আয় চলে আয়রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ অগ্নি সেতু,
দু'র্দিনে এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।"
অলক্ষণের তিলক রেখা,
রাতের ভাল হোক না লেখা,
জাগিয়ে দেরে ধমক মেরে
আছে যারা অর্ধচেতন।"

মহাকবির এই অভিনন্দন, এক নতুন আশ্বাস ও উদ্দীপনা নিয়ে এলো কাজীর মনে। ধূমকেতুর উদ্দেশ্য বলতে গিয়ে তিনি বললেন : আমার কর্ণধার আমি। আমার পথ দেখাবে আমার সত্য। আমার যাত্রা শুরু করার আগে আমি সালাম জানাচ্ছি—নমস্কার করছি আমার সত্যকে।

এদেশের নাড়ীতে-নাড়ীতে, অস্থি-মজ্জায় যে পচন ধরেছে, তাতে এর একেবারে ধ্বংস না হলে নতুন জাত গড়ে উঠবে না।... মানুষ-ধর্মই সবচেয়ে বড়

www.pathagar.org.bd

ধর্ম। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায় বা ফাঁকি কোন্‌খানে, তা দেখিয়ে দিয়ে এর গলদ দূর করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য। যার নিজের ধর্মে বিশ্বাস আছে, যে নিজের ধর্মের সত্যকে চিনেছে, সে কখনও অন্য ধর্মকে ঘৃণা করে না। ... বিদ্রোহী কবি বিদ্রোহের অর্থ সহজ কথায় প্রকাশ করে লিখরেন : বিদ্রোহী মানে কাউকে না মানা নয়; বিদ্রোহ মানে যেটাকে বুঝি না সেটা মাথা উঁচু করে 'বুঝি না' বলা। ... সত্যকে জানবার জন্য বিদ্রোহ চাই। নিজকে শ্রদ্ধা, প্রশংসার লোভ থেকে রেহাই দেওয়া চাই। বিদ্রোহের মতো যদি বিদ্রোহ করতে পারো, প্রলয় যদি আনতে পারো, তবে নিদ্রিত আত্মা জাগবেই, আসবেই।

ধূমকেতুকে নজরুল মনে করতেন রথ। তাই বিজয়-রথের রথী হয়ে ভারতে স্বাধীনতা-যুদ্ধের নির্ভীক যোদ্ধার যাত্রা হলো শুরু। নজরুল এবার ছদ্ম-নাম নিলেন, "সারথি"। ধূমকেতুর পরিচালক ঘোষণা করলেন অগ্নিঝরা বাণী :

'আমি যুগে যুগে আসি.
আসিয়াছি পুনঃ মহা-বিপ্লব হেতু—
(এই) স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু।'

আশ্বিনের নীল আকাশ আনন্দে মেতে উঠেছে। মৌসুমী পাখির মতো ঝাঁকে ঝাঁকে বের হলো শারদীয়া পত্র-পত্রিকা। চারদিকে নানা দুঃখ আনন্দের আয়োজন। এ যেন জামা গায়ে দিয়ে শরীরের ক্ষতকে ঢাকা দিয়ে রাখা। কিন্তু যার মানে আগুনের শিখা জ্বলছে, সে পারলো না একে গ্রহণ করতে। "ধূমকেতুর", শরৎ সংখ্যায় জ্বলে উঠলো অগ্নিশিখা আরো দ্বিগুণ হয়! আগুনের ফুলকি তার পাতায় পাতায় দব্‌ দব্‌ করতে লাগলো! মিথ্যা আনন্দে তিনি দায়িত্ব ভোলেন নি। দেশকে সচেতন করায় দায়িত্ব তিনি নিয়েছেন। প্রতিটি মুহূর্তে মিথ্যাচার তাঁকে সমাজের কাছে অপরাধী করে তুলবে! তাই তিনি নতুন করে রচনা করলেন। লিখলেন :

'রক্তাম্বর পর মা এবার জ্বলেপুড়ে যাক শ্বেত-বসন
দেখি ঐ করে সাজে মা কেমন বাজে তরবারি ঝনন্‌-ঝন্‌।
সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেল মাগো, জ্বলে সেথা জ্বলে কাল-চিতা,
তোমার খড়গ-রক্ত হউক স্রষ্টার বুকে লাল ফিতা!
টুটি টিপে মারো অত্যাচারে মা—গলহার হোক নীল ফাঁসি,
নয়নে তোমার "ধূমকেতু" জ্বালা, উঠুক সরোষে উদ্ভসি'।

www.pathagar.org.bd

কবির এই কবিতায় সমস্ত দেশের লোক চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লো। বেনিয়ার জাত বৃটিশ এতে পেয়েছিল বিপ্লবের গন্ধ। তাদের কোপ দৃষ্টি এসে পড়লো কবির ওপর। কিন্তু দেশপ্রেমিক, সাহসী কবি তাতে দমলেন না। তাই হিন্দুদের অসুরনাশিনী দুর্গার সামনে তিনি তাঁর ফরিয়াদ রাখলেন। রাখলেন তাঁর নালিশ :

'আর কতকাল রইবি বেটি
        মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল?'
স্বর্গকে আজ জয় করেছে
        অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল!
দেব-শিশুদের মারছে চাবুক,
        বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা,
        আসবি কখন সর্ব্বনাশী!

✪ ✪ ✪

বুদ্ধি বুড়ো সিদ্ধিদাতা
        গণেশ-টনেশ গলা ধরে
গনেশ-টনেশ চাইনা রণে

✪ ✪ ✪

কলাবৌয়ের গলা ধরে
        দাও করে দূর, দাও করে দূর,
ঐ বুঝি দেব-সেনাপতি—
        ময়ূর চূড়া জামাই ঠাকুর?
দূর করে দে, দূর করে দে,
        এসব বালাই সর্ব্বনাশী
চাই নাক ঐ ভাঙ্ খাওয়া শিব,
        সেব গিয়ে তায় গঙ্গা মাসী!
তুই একা আয় পাগলী বেটী,
        তাথৈ তাথৈ নৃত্য করে ...!

www.phulkuri.org.bd

এই কঠিন সত্য-ভাষণে ইংরেজ শাসনের বুনিয়াদ থর্ থর্ করে কেঁপে উঠলো। বেতনভোগী পুলিশেরা ঘিরে ফেলল 'ধূমকেতু' অফিস। বাজেয়াপ্ত হলো ধূমকেতুর প্রতি শারদীয় সংখ্যা। আর কবির বিরুদ্ধে বের হলো গ্রেপ্তারী পরোয়ানা।

অন্যায়ের প্রতিবাদ করা ইংরেজের কাছে অপরাধ। তিনি হলেন ফেরারী।

কারণ—কারাপ্রাচীর মানে অপমৃত্যু।

তাই আত্মগোপন করে তিনি চলে গেলেন কুমিল্লা।

কিন্তু চলল না—

পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন তিনি। এলেন প্রেসিডেন্সী জেলে। ঐতিহাসিক কারাগার। রাজদ্রোহী বৈকি! স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করা তো রাজদ্রোহ হবেই! তাই রাজদ্রোহ অভিযুক্ত হয়ে কবি এলেন আদালতে!

১৯২৩-এর ৮ জানুয়ারি তারিখ সোমবারে ব্যাঙ্কশাল কোর্টের কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ালেন বিদ্রোহী কবি নজরুল।

ম্যাজিস্ট্রেট সুইনহোর ১২৪ ধারা অনুসারে রাজদ্রোহের অপরাধে রায় দিলেন এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডের।

হাজার হাজার লোক জমে উঠলো আশেপাশে তাদের কবিকে দেখতে। লেখার অপরাধে জেল খাটছেন যিনি, স্বাধীনতার গান গাওয়ার জন্য আজ ইংরেজের কয়েদখানায় চললেন যিনি, সেই বাংলার নিজস্ব কবিকে তারা এলো অন্তরের ভালবাসা জানাতে।

সবল কণ্ঠে তিনি বলে চললেন তাঁর জবানবন্দী—আমার উপর অভিযোগ আমি রাজদ্রোহী। তাই আমি আজ কারাগারে বন্দী এবং রাজদ্বারে অভিযুক্ত।

একধারে রাজার মুকুট, অন্যধারে ধূমকেতুর অগ্নিশিখা।

একজন রাজা, হাতে রাজদণ্ড অন্যজন সত্য-হাতে ন্যায়দণ্ড।

রাজার পক্ষে বেতন ভোগী কর্মচারী; আমার পক্ষে সকল রাজার রাজা, সকল বিচারকের বিচারক, আদি-অনন্তকাল ধরে সত্য-জাগ্রত ভগবান ...

রাজার পেছনে ক্ষুদ্র। আমার পেছনে রুদ্র! রাজার পক্ষে যিনি, তাঁর লক্ষ্য স্বার্থ, লাভ অর্থ। আমার পক্ষে যিনি তাঁর লক্ষ্য সত্য, লাভ পরমানন্দ। রাজার বাণী বুদবুদ; আমার বাণী সীমাহারা মহাসমুদ্র। ...

www.phulkuri.org.bd

আমি কবি। আমি অপ্রকাশ সত্যকে প্রকাশ করার জন্য, অমৃত-সৃষ্টিকে মূর্তিদানের জন্য ভগবান কর্তৃক প্রেরিত। কবির কণ্ঠে ভগবান সাড়া দেন। আমার বাণী সত্যের প্রকাশিকা, ভগবানের বাণী। সে বাণী রাজবিচারে রাজদ্রোহী হতে পারে, কিন্তু ন্যায়-বিচারে সে বাণী ন্যায়দ্রোহী নয়, সত্যদ্রোহী। সে বাণী রাজদ্বারে দণ্ডিত হতে পারে, কিন্তু ধর্মের আলোকে, ন্যায়ের দুয়ারে তারা নিরপরাধ, নিষ্কলুষ, অম্লান, অনির্বাণ। সত্য স্বযং প্রকাশ। তাহাকে কোন রক্ত-আঁখি, রাজদণ্ড নিরোধ করতে পারে না। আমি সেই চিরন্তন স্বয়ং প্রকাশের বীণা, যে বীণায় চিরসত্যের বাণী ধ্বনিত হয়েছিল। আমি ভগবানের হাতের বীণা, যে বীণা ভাঙ্গলে ভাঙ্গতেও পারে, কিন্তু ভগবানকে ভাঙ্গবে কে?

এ কথা ধ্রুব সত্য যে সত্য আছে—চিরকাল ধরে আছে এবং চিরকাল ধরে থাকবে! যে আজ সত্যের বাণীকে রুদ্ধ করেছে, সত্যের বীণাকে মূক করতে চাচ্ছে, সে-ও তাঁরই এক ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সৃষ্টির অণু। তাঁরই ইঙ্গিতে, আভাসে, ইচ্ছায় সে আজ আছে, কাল হয়ত থাকবে না। নির্বোধ মানুষের অহঙ্কারের অন্ত নেই। সে যাঁর সৃষ্টি, তাঁকেই সে বন্দী করতে চায়, শাস্তি দিতে চায়। কিন্তু অহঙ্কার একদিন তার চোখের জলে ডুববেই ডুবনে। ...

আমার হাতের বাঁশী কেড়ে নিলেই বাঁশীর সুরের মৃত্যু হয় না। কেননা আমি আর এক বাঁশী নিয়ে বা তৈরি করে তাতে সেই সুর ফুঁ দিতে পারি। সুর আমার বাঁশীতে নয়; সুর আমার মনে এবং আমার বাঁশীর সৃষ্টির কৌশলে। দোষ আমারও নয়, আমার বীণারও নয়—দোষ তাঁর যিনি আমার কর্ণে তাঁর বীণা বাজান। প্রধান রাজদ্রোহী সেই বীণা-বাদক ভগবান। তাঁকে শাস্তি দেবার মতো রাজশক্তি বা দ্বিতীয় ভগবান নাই!...

আমার লেখায় ফুটে উঠেছে সত্য, তেজ আর প্রাণ। কেননা, আমার উদ্দেশ্য ভগবানকে পূজা করা; উৎপীড়িত আর্ত-বিশ্বাবাসীর পক্ষে আমি সত্যবারি, আঁখি-জল। আমি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি নাই, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি। আমি জানি এবং দেখেছি আজ এই আসামীর পশ্চাতে স্বয়ং সত্য সুন্দর ভগবান দাঁড়িয়ে। যুগে যুগে তিনি এমনি নীরবে তাঁর রাজবন্দী সত্য সৈনিকের পশ্চাতে এসে দণ্ডায়মান হন। রাজ-নিযুক্ত বিচারক সত্য বিচারক হতে পারে না। এমনি বিচার প্রহসন করে যেদিন খৃষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করা হলো, গান্ধীকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো, সেদিনও ভগবান এমনি নীরবে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের পেছনে এসে।

www.phulkuri.org.bd

বিচারক কিন্তু তাঁকে দেখতে পায়নি, তার আর ভগবানের মধ্যে সম্রাট দাঁড়িয়ে ছিলেন। সম্রাটের ভয়ে তার বিবেক, তার দৃষ্টি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলো।

বিচারক জানে আমি আজ যা বলছি, যা লিখছি ভগবানের চোখে তা' অন্যায় নয়, ন্যায়ের এজলাসে মিথ্যা নয়; কিন্তু তবু হয়তো সে শাস্তি দেবে। কেননা সে সত্যের নয়, সে রাজার; সে ন্যায়ের নয়, সে আইনের; সে স্বাধীন নয়—রাজার ভৃত্য।

আজ ভারত পরাধীন। অন্যায়কে অন্যায় বললে এ-রাজত্বে তা' হবে রাজদ্রোহ! এ তো ন্যায়ের শাসন হতে পারে না। এই যে জোর করে সত্যকে মিথ্যা, অন্যায়কে ন্যায়, দিনকে রাত বলানো—একি সত্য সহ্য করতে পারে? এ শাসন কি চিরস্থায়ী হতে পারে? এতদিন সায় দিয়ে সত্য উদাসীন ছিল বটে! কিন্তু সত্য আজ জেগেছে, তার চক্ষুষ্মাণ জাগ্রত আত্মা মাত্রেই বিশেষরূপে জানতে পেরেছে। এই অন্যায় শাসন-লিখা বন্দী সত্যের পীড়িত ক্রন্দন আমার কণ্ঠে ফুটে উঠছিল বলেই কি আমি রাজদ্রোহী?

কোন কিছুর ভয়েই নিজের সত্যকে, আপন ভগবানকে হীন করি নাই। লাভ-লোভের বশবর্তী হয়ে আত্ম-উপলব্ধিকে বিক্রয় করি নাই। কেননা, আমি যে ভগবানের প্রিয়, সত্যের হাতের বীণা; আমি কবি; আমার আত্মা সত্যদ্রষ্টা ঋষির আত্মা। আমি অজানা অসীম পূর্ণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি। এ আমার আত্মার নয়; আত্ম-উপলব্ধির আত্মবিশ্বাসের চেতনালব্ধ সহজ সত্যের সরল স্বীকারোক্তি আমার কণ্ঠে কাল-ভৈরবের প্রলয় তূর্য বেজে উঠেছিল। সে সর্বনাশা নিশান-পুচ্ছ মন্দিরের দেবতা নট নারায়ণ রূপ ধরে ধ্বংস নাচন নেচেছিলেন। এ ধ্বংস-নৃত্য নব সৃষ্টির পূর্ব সূচনা। আমি তাই নির্মম, নির্ভীক উন্নতশিরে সে নিশান ধরেছিলাম! অনাগত অবশ্যম্ভাবী মহারুদ্রের তীব্র আহ্বান আমি শুনেছিলাম। তাঁর রক্ত-আঁখির হুকুম আমি ইঙ্গিতে বুঝেছিলাম। আমি তখনই বুঝেছিলাম, আমি সত্যরক্ষক, ন্যায় উদ্ধারের বিশ্বপ্রলয় বাহিনীর লালসৈনিক। বাংলার শ্মশানের মায়ানিদ্রিত ভূমিতে আমায় তিনি পাঠিয়েছিলেন অগ্রদূত তূর্য-বাদক করে। আমি সামান্য সৈনিক, যতটুকু ক্ষমতা ছিল, তা' দিয়ে তাঁর আদেশ পালন করেছি!

প্রেসিডেন্সী জেল থেকে নজরুলকে পাঠান হলো আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। ওখানেও বেশিদিন রাখা হলো না। আবার বদলী করা হলো হুগলী জেলে। বৃটিশ সরকার দেশপ্রেমিকদের কারাগারে নিক্ষেপ করেও নিশ্চিন্ত থাকতে পারতো না!

www.pathagar.org.bd

ভাবতো, রাজবন্দীরা একত্র হয়ে হয়তো বা শুরু করবে বিপ্লব! তাই এক জায়গায় কোন বন্দীকেই বেশিদিন রাখা হতো না।

হুগলী জেলে গিয়ে বন্দী নজরুল পেলেন আরো অনেক সহকর্মী! তখনকার দিনে চোর-ডাকাত, খুনী আসামীদেরও রাখা হতো রাজ-বন্দীদের সঙ্গে। সুতরাং সঙ্গীর অভাব হলো না তাঁর। তাই গোপনে তাদের সকলকে নিয়ে সংগঠিত করতে লাগলেন নতুন দল। নজরুলকে পেয়ে তাঁর কথা শুনে, তাঁর বক্তৃতা শুনে সকলের মধ্যেই জাগলো নতুন চেতনা। এই সুযোগে অল্প ক'দিনের মধ্যেই তাদের নিয়ে নজরুল গড়ে তুললেন একটি দল।

সরকার আর রাজকর্মচারীদের দল সব সময়ই সতর্ক দৃষ্টি রাখতো রাজবন্দীদের উপর—বিশেষ করে নজরুলের উপর। অল্পদিনের মধ্যেই কর্তৃপক্ষ টের পেলো নজরুলের কর্মধারা। এর পুরস্কার দিতেও তারা কসুর করলো না। কলে-কৌশলে শুরু করলো তাঁর দলের উপর অত্যাচার, উৎপীড়ন। নজরুল সমস্ত রাজবন্দীদের হয়ে জেল-কর্তৃপক্ষের এই ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না; বরং ফল হলো বিপরীত। কর্তৃপক্ষের জুলুমের মাত্রা চললো আরো বেড়ে। প্রতিবাদ করেও যখন অত্যাচারিত সহকর্মী আর বন্ধুদের অতটুকু কষ্ট লাঘব করতে পারলেন না, তখন নজরুলের মন উঠলো বিষিয়ে।

কর্তৃপক্ষের অন্যায় অসঙ্গত ব্যবহারের প্রতিবাদে কবি শুরু করলেন অনশন ধর্মঘট। ফলে কবির উপর প্রতিদিনই প্রয়োগ হতে লাগলো নতুন নতুন শাস্তি। তাতেও যখন নজরুলকে শায়েস্তা করা সম্ভব হলো না, তখন জেল কর্তৃপক্ষ নানারকম ভয়-শাসানী দেখিয়ে তাঁর অনশন ভাঙ্গাতে সচেষ্ট হলেন। কিন্তু মন যার বিদ্রোহী, সত্য-ন্যায়ের দাবিতে হৃদয় যাঁর সবল, তাঁর নীতি কি কখনো কোন ভয়-ভীতির অপেক্ষা রাখে? বিদ্রোহী কবি এবার নিত্য-নতুন ব্যঙ্গ সংগীত রচনা করে দলবল নিয়ে জেল কর্তৃপক্ষকে করে তুললেন ব্যতিব্যস্ত, অতিষ্ঠ! কারাগারে শিকল-পরা কবি লিখলেন :

"এ শিকল পরা ছল মোদের, এ শিকল পরা ছল।
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করবো রে বিকল!
তোদের বন্ধ কারায় আসা মোদের, বন্দী হতে নয়।
ওরে ক্ষয় করতে আসা মোদের সবার বাঁধন-ভয়।"

www.amarboi.com

রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা 'তোমারি গেহে পালিছ স্নেহের প্যারডি লিখলেন রসিক কবি জেল-কর্তৃপক্ষকে উদ্দেশ্য করে। তাই সুর করে দলবল নিয়ে উচ্চস্বরে গাইতেন :

তোমারি জেলে পালিছ ঠেলে,
তুমি ধন্য ধন্য হে!
তোমারি গান, তোমারি ধ্যান,
তুমি ধন্য ধন্য হে!
রেখেছ সান্ত্রী পাহারা দোরে
আঁধার কক্ষে জামাই আদরে,
বেঁধেছ শিকল প্রণয় ডোরে
তুমি ধন্য ধন্য হে!
আকাড়া চালের অন্ন লবণ,
করেছে আমার রসনা শোভন
বুড়ো ডাঁটা ঘাঁটা "লপসী" লোভন
তুমি ধন্য ধন্য হে!
ধর ধর খুড়ো চপেটা মুষ্টি
খেয়ে গয়া পাবে সোজা সন্তুষ্টি
ওল-ছোলা দেহ ধবল কুষ্ঠি
তুমি ধন্য ধন্য হে!

এদিকে সারাদেশে বাতাসের মতো ছড়িয়ে পড়লো কবির অনশনের কথা। চিন্তিত হল দেশবাসী। প্রিয় কবির প্রতি সরকারী অবহেলা আর উৎপীড়নের বিরুদ্ধে দেশে জাগলো অসন্তুষ্টি। আওয়াজ উঠলো বৃটিশ সরকারের নির্দয় ব্যবহারের প্রতিবাদে।

রবীন্দ্রনাথ ভালবাসতেন নজরুলকে। তিনি তখন দার্জিলিং-এ। নজরুলের অনশনের সংবাদ তাঁকে করলো উতলা। বিদ্রোহী কবির অনশন মুখমণ্ডল ভেসে উঠলো বিশ্বকবির চোখের সামনে। কবির হৃদয়ে ব্যাকুল হলো বিদ্রোহী কবির কথা ভেবে। বিচলিত কবি টেলিগ্রামে অনুরোধ জানালেন নজরুলকে :

"অনশন ভঙ্গ কর, বাংলা সাহিত্য তোমায় চায়!"

www.phulkuri.org.bd

কিন্তু জেল-কর্তৃপক্ষ টেলিগ্রামটি নজরুলকে না দিয়ে ফেরৎ পাঠালেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। অজুহাত, ঐ নামে কোন লোক নেই এখানে। বিশ্বকবির কাছে মিথ্যার বেসাতি চালাতেও একটু দ্বিধাবোধ করলো না পুলিশ কর্মচারীর দল!

দেশময় বিরাট চাঞ্চল্য। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রমুখ নেতাগণ জেলে গিয়ে নজরুলকে অনুরোধ করলেন অনশন ত্যাগ করবার জন্য। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। কেটে গেল সপ্তাহ। তারপর পক্ষ। দেশবন্ধুর সভাপতিত্বে দেশবাসী জমায়েত হলো প্রকাশ্য সভায়। রাজবন্দীদের ওপর অন্যায় জুলুমের প্রতিবাদে আর নজরুলকে অবিলম্বে অনশন ভঙ্গ করিতে অনুরোধ জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করলো সভা। কিন্তু কবি তাতে অচল। দিন এগিয়ে চলে—কাটে সপ্তাহ—মাস। তারপর আরও কয়েকদিন। উৎকণ্ঠিতা মাতা জায়েদা খাতুন গেলেন ছেলের সঙ্গে দেখা করতে। অনুরোধ করলেন তাঁকে অনশন ভাঙ্গার জন্যে। কিন্তু তাতেও কোন ফল হলো না। শত শত অনুরোধও পারলো না তাঁর অনশন ভাঙ্গাতে। শেষটায় নজরুল অনশন ভঙ্গ করলেন একটানা চল্লিশ দিনের পর। কুমিল্লার বিরজা সুন্দরী দেবী—যাঁকে তিনি মাতৃজ্ঞানে ভক্তি করতেন—যাঁর প্রেরণা তাঁর জীবনকে করেছিল উজ্জ্বল, সেই বিরাজা সুন্দরী দেবীর নির্দেশে কবির অনশন ভঙ্গ হলো।

কারামুক্ত হলেন কবি। দেশবাসী সম্বর্ধনা জানালো তাদের কবিকে। ১৩৩০ সালের ১১ ফাল্গুন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মেদিনীপুর শাখার অধিবেশনে যোগদান করলেন তিনি। ওখানকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বিদ্রোহী কবিকে জানানো হলো সম্বর্ধনা। স্থানীয় কলেজের মহিলারা আয়োজন করলেন এক সভার। কবি নিজে গাইলেন তাঁর লেখা কয়েকখানি দেশাত্মবোধক গান; আর আবৃত্তি করলেন স্বরচিত কবিতা। মুগ্ধ হলো সকলে কবি-কণ্ঠে গান আর আবৃত্তি শুনে।

একটি তরুণী নিজের গলার সোনার হার খুলে উপহার দিলেন কবিকে। ঐ সভাতেই আরো অনেক উপহার পেলেন তিনি। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সেদিনকার সমাজ তরুণীর উপহারটিকে ভাল চক্ষে দেখতে পারেনি। মুসলমান কবির প্রতি হিন্দু তরুণীর অন্তরের ভক্তিশ্রদ্ধা অনেকেই ভাল চক্ষে দেখলেন না। গ্রাম্য-সমাজের গোঁড়া সমাজপতিদের দরবারে মেয়েটি হলো লাঞ্ছিতা। মানুষের মতো বেঁচে থাকার বুঝি আর উপায় থাকে না তার। তাই লোকের কথার জ্বালা থেকে বাঁচার জন্য নাইট্রিক এসিড খেয়ে আত্মহত্যা করলো উপায়হীনা মেয়েটি।

www.phulkuri.org.bd

তখন নজরুল কাজ করতেন 'সওগাত' পত্রিকায়। ওখান থেকে মাসিক আয়ও ছিল কম পক্ষে দু'শো টাকা। তাছাড়া বিভিন্ন রচনা আর বই লিখেও বেশ কিছু পেতেন। সুতরাং তাঁর আর্থিক অবস্থা তখন অতি স্বচ্ছল ছিল। দুর্দিনেও তিনি যেমন বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে আমোদ-আহ্লাদে দিন কাটাতেন, সুদিনেও তিনি তাদের ভোলেন নি। বরং আরও ঘনিষ্ঠতর করে নিয়েছিলেন। প্রতিদিনই অফিসের কাজ শেষ করে কবি বিকেলে বেরিয়ে পড়তেন খেলার মাঠে। সঙ্গে থাকতেন তাঁর সাহিত্যিক বন্ধুরা।

সেদিন ছিল একমাত্র বাঙালি দল মোহনবাগান ক্লাবের সাথে আর, ডি, সি, এল, আই, দলের ফুটবল প্রতিযোগিতা। বাঙালি খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত একটি মাত্র দল মোহনবাগান। তাও আবার খেলবে বিদেশী খেলোয়াড় দলের বিরুদ্ধে। তাই বেশ চাঞ্চল্য দেখা দিলো ঐ খেলা নিয়ে।

সবাই জানতো, ঐ খেলার টিকেট সংগ্রহ করা হবে ভার। তাই অনেক চেষ্টা করেও নজরুলের বন্ধু-বান্ধবরা কোন টিকেট সংগ্রহ করতে পারলেন না। তাঁরা এলেন কাজীর অফিসে। আগে থেকেই নজরুল বুঝতে পেরেছিলেন ব্যাপারটা। সুতরাং তিনি সংগ্রহ করে রেখেছিলেন বন্ধুদের জন্য টিকেট। কারণ, সাঙ্গোপাঙ্গ না হলে হাবার মতো একলা খেলা দেখে কোনদিনই তিনি আনন্দ পেতেন না। তাই সকলে খুশী হলেন।

গেলেন তাঁরা খেলার মাঠে। শুরু হলো খেলা। কাজীর পাশে সবাই দাঁড়ালেন হুশিয়ার হয়ে। কারণ খেলা দেখতে গিয়ে জ্ঞান থাকতো না তাঁর— খেলায় ডুবে থাকতেন তিনি। জ্ঞানশূন্য কাজী নিজের অজান্তে পাশের লোককেই বল ভেবে হয়তো করে বসতেন পদাঘাত; আনন্দ প্রকাশ করতে গিয়ে হয়তো বা লাফিয়ে উঠতেন "গোল-গোল" বলে! তাঁর আনন্দ-উচ্ছ্বাস দেখে মাঠের অন্যান্য দর্শকরাও হতো মুগ্ধ।

চললো খেলা। মোহনবাগান দল ৭/১ গোলে পরাজিত করলো বিদেশী দলকে (সম্ভবতঃ ১৯২৭ খৃঃ) এবার কে আর দেখে নজরুলের আনন্দ! প্রকাশ্য মাঠে তিনি শুরু করলেন উল্লাস নৃত্য! তারপর বন্ধুদের নিয়ে ঢুকলেন খাবারের দোকানে। কিন্তু কে আর কত খাবে? পকেট ছিল তাঁর গরম! কারণ, ঐদিনই পেয়েছিলেন তিনি 'সওগাত' অফিস থেকে বেতন। টাকাগুলোর তো সদ্ব্যবহার করা চাই! অতবড় একটা বিজয়ের পর এ আনন্দ অতি নগণ্য। তাই তিনি প্রস্তাব করলেন

www.phulkuri.org.bd

সবাইকে নিয়ে চন্দননগর যাবার। কে আর তাতে গররাজী হয়? সবাই একমত। কারোর বাড়িতে কোন খবর না দিয়ে ওখান থেকেই সবাই চললেন চন্দননগর। কিন্তু ওখানে গিয়েও যেন তাঁদের সাধ মিটলো না।

নজরুল সবাইকে বললেন: চলো ঢাকা থেকে ঘুরে আসা যাক। অদ্ভুত খেয়াল! কোথায় চন্দননগর আর কোথায় ঢাকা! এক জামা-কাপড়ে নজরুলের নেতৃত্বে সবাই বেড়িয়ে পড়লেন ঢাকার পথে। সেই রাত্রেই চন্দননগর থেকেই হাজির হলেন তাঁরা শিয়ালদা স্টেশনে। টিকেট করতে গিয়ে খেয়াল হোল। হিসেব করে দেখলেন, নজরুলের পকেটে যা টাকা আছে, তাতে তো অতগুলো প্রাণীর ঢাকা ঘুরে আসা সম্ভব নয়! আবার সবার পকেট শূন্য! পড়লেন এবার ভাবনায়! টাকার অভাবে কি এত বড় একটা আনন্দসূচী বাতিল করা যায়? তাই রসিক নজরুল আঁটলেন নতুন ফন্দী। বললেন: 'ঘাব্ড়াও মাত্!' এগিয়ে গেলেন তিনি স্টেশনের প্রবেশ-দ্বারে। টিকিট পরীক্ষক তো তাঁকে দেখে অবাক। শ্রদ্ধাভরে নমস্কার জানালেন কবিকে।

গৈরিকবসন পরিহিত, সুদীর্ঘ কেশধারী, বলিষ্ঠ পুরুষ নজরুল তখনকার দিনে প্রায় সকলেরই ছিলেন পরিচিত। নজরুল প্রতি-নমস্কার জানিয়ে বললেন: আপনার সাথে আমাদের কিছু কথা আছে। আমরা যাবো ঢাকা। কিন্তু টাকা যা আছে তাতে হয়তো এতগুলো লোকের খরচা কুলোবে না।' বলেই আবার বললেন : 'ভ্যাণ্ডার গাড়ীতেই যেতে রাজি আছি আমরা।' যাক্, ব্যবস্থা হয়ে গেল। চেপে পড়লেন তাঁরা ইষ্ট বেঙ্গল মেইলে। হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে গিয়ে পৌছলেন গোয়ালন্দ স্টেশনে।

স্থলপথ শেষ। বাকি পথ যেতে হবে জাহাজে। কিন্তু এতগুলো লোকের জাহাজের টিকেট করবেন কি দিয়ে? না করলেই বা চলবে কেন? এই দূরদেশে তো আর কেউ চিনবে না তাঁদের! তাই নজরুল পড়লেন ভারী মুস্কিলে! কিন্তু মুস্কিল যেখানে সেখানেই তার আসান। কি ভাবলেন কে জানে! খানিকক্ষণ পরে বন্ধুদের কি যেন নির্দেশ দিয়ে একখানা টিকেট ও একখানা মাদুর কিনে তিনি উঠে পড়লেন জাহাজে। জাহাজের পুরোভাগে ডেকের উপরে মাদুরখানা পেতে বসে পড়লেন তিনি। অন্যান্য বন্ধুরাও এরি মধ্যে হাজির। অথচ টিকেট ছিল না তাদের একজনেরও। নজরুল এবার হাঁটুগেড়ে বসলেন মাদুরের উপর। আর ধরলেন গজল গান। তাঁকে ঘিরে বসা বাকি বন্ধুরা কেউ মাথা নেড়ে, কেউবা হাততালি দিয়ে তালের সমতা রাখতে লাগলেন।

www.phulkuri.org.bd

দেখতে দেখতে ভিড় জমে গেল। শুধু যাত্রীরাই নয়, নজরুলের সুমিষ্ট সুরের গজল শুনে জাহাজের কর্মচারীরাও আকৃষ্ট হলেন! ব্যাপার হলো গুরুতর। পাশে বেশি ভিড় হওয়ায় একদিকে কাত হয়ে পড়লো জাহাজ। জাহাজ চালানো হলো মুস্কিল। তাই রেগেমেগে নেমে এলো জাহাজের কাপ্তেন। কিন্তু রাগ করবে কার সাথে? সে-ও মজে গেলো গজল শুনে। যেমনি গলা আর সুর, তেমনি তার ভাবভঙ্গী।

কাপ্তের এবার নজরুল, এবং তার বন্ধুদের জাহাজের মাঝখানে বসে গজল গাইতে সাদর অনুরোধ করলো! জাহাজের টিকেট পরীক্ষকও গজল শুনে হলেন অভিভূত। ভুলে গেলেন তিনি যাত্রীদের টিকেট পরীক্ষা করে দেখার কথা। নিজের হারমোনিয়াম আর তবলা নামিয়ে দিলেন আর নজরুলের বন্ধুদের খোঁজ নিতে লাগলেন, তাদের কোন অভাব অভিযোগ আছে কিনা! এমনি করে মাত্র একখানা টিকেট করে নজরুল সদলবলে এসে হাজির হলেন গন্তব্য স্থানে।

বন্ধুদল নিয়ে রসিক নজরুল এবারে পৌঁছলেন ঢাকা শহরে। কিন্তু মুশকিল হল তাঁদের থাকা-খাওয়া নিয়ে! এতগুলো লোক নিয়ে তো আর যে কোন এক বাড়িতে ওঠা সম্ভব নয়! তাই পড়লেন ভারী ভাবনায়। অনেক ভেবে তাঁরা বিভক্ত হলেন ক'টি দলে! তারপর ছোট ছোট দল নিয়ে এক একজন খুঁজতে বেরুলেন নিজ নিজ আত্মীয়-বাড়ি। নজরুল বুদ্ধদেব বসু ও আর ক'জন রইলেন এক দলে। বুদ্ধদেব বাবুর ভগ্নিপতি তখন ঢাকায় উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। তাই এ দলের ভার নিতে হল তাঁকেই। কিন্তু যা একটু ভাবনায় পড়লেন নজরুলকে নিয়ে। কারণ, তখনকার দিনে হিন্দু সমাজ আজকের মতো এতটা আগ্রহী ছিল না? জাতিভেদ প্রথা আর কৌলিন্যের বড়াই ছিল সমাজে বর্তমান। তাই নজরুলকে "নজরুল" পরিচয়ে তো আর তাঁর আত্মীয়-বাড়ি নেওয়া সম্ভব নয়! তা' হলে হয়তো তাঁদের ঠাঁই মিলবে না সেখানে।

ভাবলেন—সবাই ভাবলেন কি করা যায়। অনেক ভেবে তাঁরা নজরুলের অস্থায়ী নাম রাখলেন স্বামী রামানন্দ বাবা! বেশ মানানসই হল নামটি। কারণ, আগেই বলেছি,—নজরুল পরতেন তখন গৈরিক বসন, বাউলের মতো ছিল তাঁর বলিষ্ঠ দেহ ও চোখে-মুখেও ছিল এক অপূর্ব দীপ্তি! কৌতুকপ্রিয় বন্ধুদের সাথে নজরুলকে নিয়ে বুদ্ধদেব বাবু এবার হাজির হলেন তাঁর আত্মীয় বাড়ি। সন্ন্যাসীবেশী নজরুলকে দেখে বাড়ির লোক তাঁর পরিচয় জানতে চাইলেন। বুদ্ধদেব বাবু

www.phulkari.org.bd

নজরুলকে বেলুর মাঠের রামানন্দ বাবাজী বলে পরিচিত করালেন। মুহূর্তেই বাড়ি মধ্যে আনন্দের রোল পড়ে গেল। সবাই হলেন মহাখুশী। লোকে যাঁকে ডেকে পায় না, সে কিনা অযাচিত অতিথি! সৌভাগ্যবান তো তারা বটেই! সাধক পুরুষের পদধূলি পেয়ে বাড়ির সবাই ধন্য হলেন। পাড়া-পড়শীদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়লো 'বাবাজী'র নাম। সবাই আসতে লাগলো তাঁর দর্শন লাভ করতে। ভক্তি প্রণাম জানিয়ে ছোট বড় সবাই হলো ধন্য! এবার আসতে লাগলো মিঠাই মণ্ডা, ফলমূল আরও কত রকম ভেট! এমনি করে রাজার হালে কাটতে লাগলো তাঁর "বাবাজীর জীবন।"

নজরুলের প্রতিভা ছিল বহুমুখী। গণক হিসেবেও তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। হাত দেখে লোকের ভূত ভবিষ্যৎ বলতে তিনি ছিলেন অব্যর্থ। তা'ছাড়া বেদ-বেদান্ত, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি হিন্দুধর্ম পুস্তকের উপর তাঁর যথেষ্ট দখল এবং হিন্দু দর্শন সম্বন্ধেও তাঁর অসামান্য জ্ঞান ছিল। তাই তাঁর এই গুণাবলী "বাবাজী জীবনে" বেশ কাজে লেগেছিল। মাঝে মাঝে তিনি শ্রীমদ্ভগবত গীতার শ্লোক, ধর্মের আলোচনা এবং সময় সুযোগমত সঙ্গীত শুনিয়ে ভক্তবৃন্দকে অভিভূত করে তুললেন। ভক্তবৃন্দও বেশ দু'বেলা আসতো "বাবাজীর" দর্শন লাভ করতে আর তাঁর মুখের দু'টি কথা শুনতে।

এইতো গেল তাঁর রসিকতার একটি দিক। দায়িত্বজ্ঞান বোধও ছিল তাঁর প্রচুর। তাই পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলা থেকে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন আইন সভার প্রার্থী হয়ে।

নজরুল জীবনে হিন্দু-মুসলমান অনেকের কাছ থেকেই পেয়েছেন আঘাত। অনেকেই প্রথম তাঁকে বুঝতে বা চিনতে পারে নি। কারণ সকল ধর্মের মধ্যেই তিনি দেখেছিলেন সত্যরূপ। হিন্দু ধর্মকে যেমন তিনি শ্রদ্ধা করতেন, ইসলাম ধর্মকেও করতেন ততখানি ভক্তি। তাই অনেক সময় অনেকে তাঁকে বুঝে উঠতে পারে নি। আইন-সভার প্রার্থী হয়ে যখন তিনি সাধারণ লোকের ভোটপ্রার্থী, তখন একদিন মৌলবী তমিজউদ্দীন তাঁকে 'কাফের' বলে সম্বোধন করেছিলেন। নজরুল কিন্তু তাতে একটুও বিচলিত হননি। হেসে শুধু বলেছিলেন: "আপনি আমাকে কাফের বলছেন, কিন্তু এর চেয়েও কঠিন কথা আমাকে শুনতে হয়; আমার গায়ের চামড়া এত পুরু যে, আপনাদের কথার বাণ তা ভেদ করতে পারে না। তবে আপনি যদি আমার দু'একটি কবিতা শোনেন, তো ভারি খুশী হবো।"—বলেই নজরুল তাঁর

www.phulkuri.org.bd

রচিত "মহরম" কবিতাটি আবৃত্তি করতে থাকেন। কবিতার অর্থ বুঝে মৌলবী ও তাঁর দলের সবাই বুঝতে পারেন ইসলাম ধর্মের প্রতি নজরুলের কতখানি শ্রদ্ধা ও মমতা। তাই "মহরমের" আবৃত্তি শুনতে শুনতে তাঁদের চোখ বেয়ে ঝরতে থাকে অনুতাপের অশ্রু।

হাসি ঠাট্টা আর আনন্দ নজরুলের সরল সহজ মনে যেমন ছিল, আত্মমর্যাদা জ্ঞানও ছিল তাঁর যথেষ্ট। হয়তো সে কারণেই তিনি লিখতে পেরেছিলেন, 'আপনারে ছাড়া কাহাকে কবি না কুর্ণিশ।' রাজ-মর্যাদায় যে যত বড় থাক না কেন।

কবি কাউকে পরোয়া করে চলতেন না। স্বাধীন মুক্ত কবির জীবনে এর প্রমাণ আছে ভুরিভুরি।

কবি তখন ঢাকা শহরে। ঢাকার নবাব পরিবারের কয়েকজন খান্‌বাহাদুর বাংলার বিদ্রোহী কবির সঙ্গে পরিচয় লাভের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বিশেষ অনুরোধ করে কবিকে তাঁরা আমন্ত্রণ জানালেন। নজরুল তাতে গররাজী হলেন না। খান্‌বাহাদুরেরা কবির ভোজ-সভার আয়োজন করলেন। বুড়ীগঙ্গার শান্ত সুনীল জল—তার উপরে ঘন নীলরঙের সুন্দর বজরা। কবির অভ্যর্থনা উপলক্ষে বজরার চাকচিক্য গেছে আরো অনেক বেড়ে। এলেন খান্‌বাহাদুর দল। কবির আগমন প্রত্যাশায় তাঁরা বসে রইলেন। কিন্তু কৈ, কবি কোথায়? কোথায় নজরুল। নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ। রাগে, লজ্জায় খান্‌বাহাদুরদের চোখ-মুখ হয় ওঠে রাঙা। কথা দিয়ে এই ভোজসভায় কেউ আসবে না, এ যেন কল্পনার অতীত! খান্‌বাহাদুরদের সাত-পুরুষে এমন ঘটনা আর কখানো ঘটেনি। এ যে শুধু খানবাহাদুরদেরই নয়, তাদের বংশ-মর্যাদারও অবমাননা।

বহু লোকজন বেরিয়েছে কবির খোঁজে। খোঁজ-খোঁজ-খোঁজ। অনেক খোঁজা-খুঁজির পর এক বন্ধুর আড্ডা থেকে উদ্ধার করা হলো কবিকে। কবি সেখানে বন্ধুদের সঙ্গে ছিলেন আনন্দে মশগুল। খান্‌বাহাদুরদের ভোজসভার কথা স্মরণ করিয়ে দিতেই কবির একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। কথা খেলাপের জন্য মনে অনুশোচনা এলো। সমস্ত ব্যাপারটা শুনে এক বন্ধু অবাক হয়ে তাঁকে বলে উঠলো : এ কি করছো কাজী! যাদের সাক্ষাৎ লাভ সাধারণ মানুষের বাইরে, সেই সব বহু সম্মানীয় খান্‌বাহাদুররা তোমার জন্য বজরায় অপেক্ষা করছেন, আর তুমি কিনা ...!

www.amarboi.org.bd

কবির সম্মানে আঘাত করলো। রাজাবাহাদুর আর খান্‌বাহাদুরদের চাইতে কি তবে কবির সম্মান কোন অংশে কম? কবি আর খানসাহেব! কবি হলেন গভীর। সেই গাম্ভীর্যের প্রকাশ ঘটলো তাঁর সদম্ভ উত্তরে। তিনি বললেন : আমি দেশের কবি। খান্‌বাহাদুররা আমার জন্য অপেক্ষা করবেন না তো কি করবেন? আমি তাঁদরে কৃপা-প্রার্থী নই। আমি কবি। আমি নজরুল। সম্মান আমার নয়, আমার কবি মনের! আমি রাজপথ দিয়ে চলবো, দেশের খান্‌বাহাদুররা, রাজাবাহাদুররা পথের দু'ধার থেকে আমায় জানাবেন কুর্ণিশ। আর সেই কুর্ণিশ গ্রহণ করতে করতে আমি এগিয়ে যাবো। এইতো কবি আর খানবাহাদুরের মধ্যকার সত্যিকার সম্বন্ধ।

কবির এই উত্তর শুনে সবাই অবাক। এমনিভাবে সত্যকে কেউ প্রকাশ করতে পারে, এ ছিলো বন্ধুদের এতদিন অজানা।

এর পরে কবি সেই ভোজসভার যাবার প্রয়োজন বোধ করলেন না। শোনা যায়, একবার কবি হলেন তাঁর এক হিন্দু বন্ধুর বিয়েতে বরযাত্রী! বন্ধুটি ছিলেন কুলিন ব্রাহ্মণ ঘরের ছেলে। বিয়ে বাড়িতে হৈ-হুল্লোর। বরযাত্রীদের সমাদরের ব্যবস্থাও হয়েছে খুব। বরযাত্রীদল যথাসময়ে খেতে বসলেন। কিন্তু আনন্দমুখর বিয়ে বাড়িতে যেন হঠাৎ নিরানন্দের ভাব থম্‌থম্‌ করে উঠলো। বরযাত্রীর দল বসে আছেন সত্য, কিন্তু কেউ আর তাঁদের কাছে ঘেঁষছে না। লজ্জায় অপমানে বরযাত্রীদের চোখ-মুখ জ্বল জ্বল করে উঠলো। এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করে উঠলো সকলে। তখন একজন সবিনয়ে বললো দেখুন, আপনাদের দলে নাকি কে একজন মুসলমান আছেন তাই ব্রাহ্মণ-বাড়ির মেয়েরা আপনাদের খাদ্য পরিবেশন করতে চাইছে না।

সবার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। নজরুল! নজরুল বাংলার কবি! কবির আবার জাত! এ যে জাতের নামে বজ্জাতি। অন্যায় অবিচারের ছায়া কবি কোন দিনই সইতে পারতেন না। বিয়ের বাসরে অন্যান্য বন্ধুরা যখন এ ব্যাপার নিয়ে উত্তেজিত কবি তখন সবার অগোচরে লেখায় মগ্ন। এ লেখা শুধু কবিতা লেখা নয়—এ যেন আগুনের ফুল্‌কি। জাতের নামে বজ্জাতি—কুসংস্কারের অগ্নিজ্বালা। কবি লিখলেন :

www.phulkuri.org.bd

জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াত খেলছে জুয়া,
ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয়তো মোয়া!
হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি, ভাবলি এতেই জাতের জান,
তাইতো বেকুব, করলি তোরা এক জাতিকে একশো খান্!
এখন দেখিস ভারত জোড়া
পচে আছিস্ বাসি মড়া,
মানুষ নাই আজ, আছে শুধু জাত শেয়ালের হুক্কহুয়া!

কবির এ কবিতা শুনে বিয়ে বাড়ির আবহাওয়া অন্যরূপ হলো। বিয়ে বাড়ির ছোট বড় সকলেই বুঝতে পারলো তাদের অপরাধ। কবির কাছে তারা ক্ষমতা প্রার্থনা করতে লাগলো। ভক্তি-শ্রদ্ধার নত হলো তারা কবির কাছে।

নজরুলের কবিতা লেখার জন্য কোন বিশেষ পরিবেশের প্রয়োজন হতো না। যেখানে সেখানে বসে, যখন তখন খেয়ালখুশী মতো কবিতা লিখতেন তিনি।

১৩৩২ সালের আষাঢ় মাসে বাঁকুড়া জেলা যুব ও ছাত্র সম্মেলন থেকে আমন্ত্রিত হলেন কবি। সম্মেলন হবে বাঁকুড়া কলেজ প্রাঙ্গণে। ঐ কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন তখন একজন ইংরেজ। নাম তাঁর ব্রাউন সাহেব। বিদেশী হলেও স্বদেশী আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন তিনি। দেশের ছেলেমেয়েদের গড়ে তুলতে সব সময়ই তিনি সচেষ্ট থাকতেন। বাঁকুড়া শহরের সকলের কাছেই তাই তিনি প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর স্ত্রীও ছিলেন অমায়িক। এ বিদেশিনীর মাতৃস্নেহ কলেজের ছাত্রদের করে ফেলেছিল ঘরের ছেলের মতো।

বিদেশী হলেও মিঃ ব্রাউন ও তাঁর স্ত্রী উভয়েই বাংলা ও বাংলাদেশের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাই অল্প কিছু দিনের মধ্যে দু'জনেই বাংলা ভাষা শিখে নিয়েছিলেন। বাংলা সুন্দর লিখতে পারতেন, পড়তে পারতেন।

নির্দিষ্ট দিনে নজরুল রওয়ানা হলেন বাঁকুড়া কলেজ অভিমুখে। সঙ্গে চললো একদল কিশোর। কবি সারারাত গান গেয়ে আর আবৃত্তি করে জাগ্রত রাখলেন যাত্রীদের। যাত্রা হলো শেষ। বাঁকুড়া স্টেশনে এসে ভোরের দিকে গাড়ী থামলো।

গাড়ী থেকে নামলেন কবি—বাংলার বিদ্রোহী বীর। বাঁকুড়ার তরুণ ছাত্ররা অভ্যর্থনা জানালো কবিকে। সারিবদ্ধ তরুণদের সকলেই মালকোছা দিয়ে কাপড় পরা। হাতে তাদের সমান মাপের লাঠি। তাদের সঙ্গে বলিষ্ঠ দেহ, সুদর্শন মূর্তি মিঃ ব্রাউন আর তাঁর স্ত্রী।

www.phulkuri.org.bd

চারিদিক থেকে উঠলো জয়ধ্বনি। বিপ্লবী কবির শিরায় শিরায় জাগলো শিহরণ। তরুণ সৈনিকের সারিবদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করলেন কবি। মিঃ ব্রাউন আর তাঁর স্ত্রী এগিয়ে গেলেন। জোড়হাতে নমস্কার জানালেন তাঁরা বিদ্রোহী কবিকে। তাঁদের পেছনেই ছিলো জাতীয় পতাকা। পতাকা উড্ডীন করে অগ্রপথিক তরুণদল ধ্বনি তুললো "বন্দেমাতরম"। আকাশ-বাতাস হলো মুখরিত।

এগিয়ে চললেন কবি। সঙ্গে চললেন মিঃ ব্রাউন ও তাঁর স্ত্রী! কবির চোখ পড়ে হঠাৎ তাঁদের হাতের দিকে। প্রথমে নিজের চোখকেই অবিশ্বাস করেন। আবার ভাল করে তাকান। দেখেন, দুইজন ইংরেজের হাতে দু'খানা কবির লেখা কাব্যগ্রন্থ। একজনের হাতে "বিষের বাঁশী", অপর জনের হাতে "ভাঙার গান'। অবাক হয়ে যান তিনি। কারণ, বই দু'খানা বাজারে তখনো বাজেয়াপ্ত ছিলো। যার কাছে এ বই পাওয়া যেতো, তাকেই গ্রেপ্তার করা হতো। ইংরেজের ভয় ছিলো এই বই দু'খানার উপর। তারা জানতো ঐ কবিতার বইয়েই ছিলো মুক্তির মন্ত্র আর যৌবনের উচ্ছাস। তাই রাইফেল, বন্দুক, ষ্টেনগান, মেশিনগানের চাইতেও ইংরেজের কাছে ঐ বই দু'খানি বেশি বিপজ্জনক ছিলো। কবির অবাক প্রশ্নের উত্তরে বিদেশী স্বামী-স্ত্রী কবিকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন : বাংলাভাষায় এমন যৌবন ও তারুণ্যের সুর আর কোথাও নাই। বই দু'খানি পড়ে সব সময়ই আমরা আনন্দ পাই।

কথায় কথায় কবিকে নিয়ে মিঃ ব্রাউন ও তাঁর স্ত্রী ষ্টেশনের বিশ্রামাগারে গেলেন এবং সেখানেই তাঁর জলযোগের আয়োজন করলেন। বাইরে অপেক্ষমান তরুণ ছাত্রদল। কবির দর্শন পেয়ে মনে তাদের আনন্দের সীমা নেই; বাংলার বিদ্রোহী কবিকে পেয়ে তাদের মনে জাগলো আনন্দোচ্ছাস। গুন-গুন স্বরে কয়েকজন আবৃত্তি করে উঠলো :

ঐ ক্ষেপেছে পাগলী মায়ের দামাল ছেলে
কামাল ভাই ....

কবির সচেতন কানে আবৃত্তির সুরে ভেসে গেলো। মুহূর্তেই তিনি ভুলে গেলেন বর্তমানকে। ফিরে গেলেন সেই সৈনিক-জীবনের স্মৃতিতে। মনে পড়লো সুদূর করাচী, আর করাচীর সৈন্য-শিবির। এ যে সেই "কামাল পাশা"। করাচীর সৈন্য-শিবিরে বসে লেখা তাঁর প্রথম যৌবনের অমরসৃষ্টি "কামাল পাশা"! উত্তেজিত হয়ে উঠলেন কবি, নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না। ছুটে এসে ছেলেদের সঙ্গে যোগ দিয়ে নিজেই আবৃত্তি শুরু করলেন:

www.pathagar.org.bd

ঐ ক্ষেপেছে পাগলী মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই—
অসুরপুরে শোর উঠেছে, জোরসে সামাল, সামাল ভাই!
কামাল! তুনে কামাল কিয়া ভাই
হো-হো কামাল! তুনে কামাল কিয়া ভাই!!

যুব ও ছাত্র-সম্মেলন শেষ করে কবি বিষ্ণুপুর রওয়া হলেন।

এককালে বিষ্ণুপুরের রাজারা সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। তাঁদের গড়, কামান প্রভৃতি আজও সেই অতীতের কীর্তিকাহিনী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। স্বাধীন রাজার রাজবাড়িতে ঢুকেই নিজ হাতে কপালে এঁকে নিলেন মাটির তিলক; যে মাটির প্রতিটি অণুতে রয়েছে স্বাধীন রাজার স্বাধীন সত্তা। গড়ের সামনেই এক বিরাট কামান। তা দেখে কবির মনে জাগলো আনন্দের ঢেউ। ছুটে গিয়ে তিনি আলিঙ্গন করলেন স্বাধীন রাজার ঐ কামানটিকে। তাঁর চোখে ভেসে উঠলো স্বাধীন রাজা আর স্বাধীন-দেশের স্বপ্ন!

কবি তখন হুগলীতে। অনিয়মে চারিদিকে ঘুরে ঘুরে শয্যা নিয়েছেন। প্রবল জ্বর, রক্ত আমাশয়ে কবি প্রায় নির্জীব হয়ে পড়লেন।

এমন সময় পশ্চিমের আকাশে দেখা গেল মেঘের ঘনঘটা। চোখ বুঁজে পড়ে আছেন কবি। কথা নেই, নেই এতটুকুও সাড়া-শব্দ! কবির চোখে-মুখে ফুটেছে ক্লান্তির ছায়া। হঠাৎ উঠলো ঝড়। ঝড়ের পাগলা হাওয়ার ঝাপটায় ঘরের দরজা-জানালাগুলো সশব্দে আর্তনাদ করে উঠলো। ওদিকে কাজল-কাল মেঘের ছুটাছুটি শুরু হয়েছে সারা আকাশে। বাতাসের শন্‌শন্‌ শব্দে কবির চোখ খুললো। কবি দেখলেন, ঝড়! ঝড় জাগলো তাঁরও মনে। হঠাৎ শিশুর মতো উল্লাসিত হয়ে অসুস্থ কবি লাফিয়ে উঠলেন। বললেন: আয় ঝড় আয়—আয় আমার প্রাণে। ছুটে চললেন কবি ছাদের দিকে। কালনাগিনীর মতো ঝড়ের পাগলা হাওয়ার কবির সুদীর্ঘ বাব্‌রি চুল উড়তে লাগলো। বললেন : আমি ঝড়! আমি ঝড়! ঝড়ের শেষে এলো জল। অসুস্থ কবিকে জোর করে ঘরে আনা হলো। কিছুতেই কবি শয্যা নিলেন না। খাতা-পেন্সিল নিয়ে একটানাভাবে লিখে চললেন—

ঝড় কোথা? কৈ?
বিপ্লবের লাল ঘোড়া ঐ ডাকে ঐ!
ঐ শোন শোন তার হ্রেষার চিক্কুর
ঐ তার ক্ষুর-হানা মেঘে।

না না আজ যাই আমি আবার ফিরে
হে বিদ্রোহী বন্ধু মোর তুমি থেকো জেগে।

বিপ্লবী কবির সম্বর্ধনায় দেশ যখন মেতে উঠেছে কবি তখন বাঁধা পড়লেন। যাত্রা শুরু হলো নতুন পথে, নতুন ভাবে। ১৯২৪ সালের ২৪ এপ্রিল কবি বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। হিন্দু ঘরের মেয়ে গিরিবালা সেন গুপ্তার কন্যা প্রমীলা দেবী হলেন কবির সহধর্মিণী। উপযুক্ত পাত্রের হাতে কন্যা দিতে পেরে গিরিবালা দেবী হলেন তৃপ্ত। মুসলমান কবির সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে তাঁকে সমাজের সঙ্গে কম সংগ্রাম করতে হয়নি! কিন্তু শত বাধা-বন্ধনও তাঁকে পথচ্যুত করতে পারে নি!

হুগলীতে থাকাকালেই কবির প্রথম পুত্র-সন্তান জন্মালো। নাম রাখলেন 'কৃষ্ণ-মোহাম্মদ'। কিন্তু তাঁর প্রথম পুত্র কয়েক মাসের মধ্যেই মায়া ত্যাগ করলো। এরপরই শুরু হলো তাঁর দুঃখময় জীবন। আর্থিক অনটন তাঁকে করে তুললো ব্যতিব্যস্ত! হুগলী ছেড়ে কবি সপরিবারে চলে গেলেন কৃষ্ণনগর।

১৯২৬ সালের ২ এপ্রিল কোলকাতায় শুরু হলো হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা। ভাইয়ের বুকে ভাই ছুরি বসাতে উদ্যত। ঘৃণা ও ক্ষোভে কবির মন হয়ে উঠলো বিষাক্ত। দেশের নেতাগণও তখন বিভ্রান্ত হলেন দাঙ্গার কথা ভেবে! কবি কণ্ঠে জাগলো নতুন সুর। ভাইয়ে ভাইয়ের হানাহানি যে ইংরেজ রাজত্বের বুনিয়াদ করে তুলবে সুদৃঢ়, স্বাধীনতার আলোক যে হবে অদৃশ্য একথা তিনি বার বার সবল কণ্ঠে ঘোষণা করলেন। কৃষ্ণনগরে সেবার বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলন আয়োজন করা হলো। কবি নিমন্ত্রিত হলেন উদ্বোধনী সঙ্গীত গাইতে। দেশের তরুণ-যুবকদের কাছে মনের কথাকে খুলে বলার সুযোগ পেলেন তিনি। "কাণ্ডারী হুশিয়ার" শিরোনামায় সঙ্গীত রচনা করে নিজেই সুর দিলেন তাতে। তারপর উদ্বোধনী সঙ্গীত গেয়ে উদ্বোধন করলেন কংগ্রেস সম্মেলন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পথভ্রষ্ট হিন্দু-মুসলমান সকলকে আহ্বান জানিয়ে তিনি গাইলেন :

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি পণ।
'হিন্দু না ওরা মুসলিম?' ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?
কাণ্ডারী! বল, ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মা'র।

বেশ কিছুদিন কেটে গেল। নজরুল এবার কোলকাতার পথে পা বাড়ালেন। তাঁর গান, সুর আর রচনার জনপ্রিয়তা ক্রমে বেড়ে চললো। কোলকাতার বেতার কেন্দ্র থেকে তাঁকে চাকুরী দেয়া হলো। নিজ গুণে বেতার কেন্দ্রের যথেষ্ট উন্নতি করলেও, দলগত চক্রান্তের ফলে কবি বেশিদিন সেখানে থাকতে পারলেন না। তারপর একটা গান লেখা আর তাতে সুর দেয়া শুরু করলেন। এই সুযোগ নিয়ে গ্রামোফোন কোম্পানী সরল সহজ কবিকে পেয়ে বসলেন। এমন কোন সঙ্গীত বাদ ছিল না, যা তিনি না লিখেছেন আর না সুর দিয়েছেন। বৈষ্ণবগীতি থেকে আরম্ভ করে—ঠুংরি, গজল, কীর্তন, ভাটিয়ালি কোন কিছুই তিনি বাদ দেননি। গানকে তিনি ভালবাসতেন প্রাণের চেয়েও অধিক। শোনা যায়, কোনরকমে একবার কবিকে বসাতে পারলে, পাতার পর পাতা ভরে তুলতেন তিনি নানা সঙ্গীতে আর সুরে। গ্রামোফোন কোম্পানী এবং অন্যান্য বহু বই প্রকাশক কবিকে বন্ধ ঘরে রেখে গান আর অন্যান্য লেখা তাঁদের চাহিদা মতো আদায় করে নিয়েছেন। আপনভোলা উদাসমনা কবি এমনি করে দিনের পর দিন ডুবে থেকেছেন ভাবের সাগরে।

১৩৩৫ সাল। ১৫ জ্যৈষ্ঠ, কবির আনন্দময় জীবনে দেখা দিল দুঃখ। মাতৃহারা হয়ে শোকে আকুল হলেন তিনি। দুঃখ যখন আসে তখন নানা দিক থেকে আসতে থাকে। তাই মাতৃ-বিয়োগ-ব্যথা ভুলতে না ভুলতেই কবির প্রিয় সন্তান চার বছরের শিশু বুলবুলের হল মৃত্যু। শত দুঃখ-শোকও কবিকে কোনদিন অধীর করতে পারেনি। কিন্তু বুলবুলের অকাল-বিয়োগে তিনি অধীর হয়ে পড়লেন। কবি চেষ্টা করলেন দুঃখ শোক ভুলে যেতে। এবার নানা রকম ধর্মগ্রন্থ হলো তাঁর একমাত্র সঙ্গী। তাঁর জীবনের গতি গেলো ঘুরে। শোকতাপ জয় করে তিনি ভুলে গেলেন পুত্রের বিয়োগ-ব্যথা। এ দুঃখ-সাগরের মাঝে থেকেই কবি রচনা করলেন হাস্য-রসভরা শিশু কাব্য 'চন্দ্রবিন্দু'।

শোকতাপ ভুলে যেতে চাইলেন কবি; কিন্তু শোক তাঁকে ভুলতে পারলো না। ১৩৪৭ সাল। কবির জীবনে দেখা দিলো বিপদ ও দুঃখ। কবির জীবন-সঙ্গিনী প্রমীলা দেবী পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হলেন। নজরুলের সরল মন সব কিছুতেই বিশ্বাস করতো। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল মানুষের উপরেই ছিল তাঁর গভীর বিশ্বাস। কোন কারণেই কোন লোককে প্রথমে তিনি অবিশ্বাস করতে পারতেন না। তার জন্য অবশ্য কম বেগ পেতে হয়নি তাঁকে।

www.shodhkuri.org.bd

কবি-পত্নী তখন রোগশয্যায়। অবসাঙ্গ রোগে তিনি অসাড়। এ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি থেকে শুরু করে কবিরাজী হেকিমী কোন চিকিৎসারই তিনি কসুর করলেন না। রুগ্না স্ত্রীর আরোগ্যের জন্য দু'হাতে টাকা খরচ করলেন তিনি। কিন্তু তাতেও কোন ফল পেলেন না কিন্তু তবুও তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল, তাঁর স্ত্রীর ব্যাধি নিরাময় হবেই। কোন্ সাধু কোথায় কবে ভরসা দিয়েছেন, কোন্ যোগী-পুরুষ এই রোগ মুক্তির জন্য কি নির্দেশ দিয়েছেন—একান্ত অনুগতের মত কবির সরল-সহজ মন তাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে।

একবার নজরুল খবর পেলেন, বীরভূম জেলার এক গ্রামে দৈব ঔষধ পাওয়া যায়। বহু রোগী নাকি ঐ ঔষধে আরোগ্য লাভ করেছে। এ সংবাদ কবিকে করে তুললো অস্থির। ভাবলেন, স্ত্রীর অসুখ এবার নিশ্চয়ই ভাল হবে। তাই খবর পাওয়া মাত্র এক বন্ধুকে নিয়ে তিনি রওনা হলেন বীরভূমে। পৌঁছলেন তিনি বেলেগ্রামে। গ্রামের মাঝখানেই এক প্রাচীন দেবমন্দির। আশেপাশে জংগলে ভর্তি। ভাংগা মন্দিরের দেয়াল ভেদ করে মাথা উঁচু করে উঁকি দিচ্ছে ক্ষুদে অশ্বত্থের দল! তার মধ্যে বাস করেন এক বুড়ো সাধক। নজরুল পবিত্র মনে হাজির হলেন তাঁর কাছে! শ্রদ্ধাভরে প্রণাম জানিয়ে প্রার্থনা করলেন ঔষধ। মন্দিরের সেই বুড়ো সাধক চক্ষু বুঁজে কি একটু ভাবলেন; তারপর গভীরভাবে তাঁকে নির্দেশ দিলেন, পাশেই অবস্থিত একটি এঁদো পুকুরের জলে স্নান করে পবিত্র হতে। নির্দেশ মতো ঐ পচা পুকরে তিনি স্নান করলেন। তারপর ঐ পুকুরের ভেজা মাটি, শ্যাওলা ও একটু তেল নিয়ে তিনি কোলকাতা ফিরলেন। তারপর ঐ তেল, শ্যাওলা আর পুকুরের মাটিতে চললো কবি-পত্নীর চিকিৎসা।

দিন যায়—সপ্তাহ, পক্ষ। কিন্তু কোন পরিবর্তনই হয় না রোগীর। রোগীর রোগ বরং আরো জটিল হয়ে দেখা দিল। অবস্থা দেখে কবির মন দুর্ভাবনায় ভরে উঠল। দিশেহারা কবি হলেন উতলা। এমন সময় তিনি পেলেন আর এক নতুন সন্ধান। শুনলেন, কোলকাতা থেকে প্রায় পনর মাইল দূরে ডায়মন্ডহারবারের গ্রামে, নাকি একজন সাধক পুরুষ থাকেন। ভূতসিদ্ধ ও অসীম ক্ষমতার অধিকারী তিনি। ঘরভরা মানুষের সামনে নাকি ভূত হাজির করতে পারেন তিনি। ভূত নিয়েই নাকি তাঁর কারবার। ভূত তাঁর কথা শোনে; আর এ ভূতের সাহায্যেই নাকি তিনি লোকের অসুখ-বিসুখ আরোগ্য করতে পারেন। এতসব রোমাঞ্চকর কথা শুনে কবি তো অবাক! সাধকের প্রতি শ্রদ্ধায় ভক্তিতে ভরে উঠলো কবির মন। সংগে

www.phulkuri.org.bd

সংগে তিনি ঠিকানা সংগ্রহ করে ঐ ভূতসিদ্ধ সাধকের কাছে লোক পাঠিয়ে দিলেন। বলে দিলেন টাকার মায়া করো না। যত টাকাই লাগুক, ঐ টাকা সাধককে দিয়ে চিকিৎসা করাতেই হবে।

চুক্তি হলো, সাধককে পঁচিশ টাকা অগ্রিম সেলামী দিতে হবে। তারপর রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হলে দিতে হবে পাঁচশত টাকা। কবি তাতেই রাজি হলেন। রোগ সারা নিয়ে কথা, টাকা যতই লাগুক।

এক শীতের রাত্রে কবি দু'জন বন্ধুকে নিয়ে হাজির হলেন ডায়মণ্ডহারবারের সেই অজ পাড়াগাঁয়ে। একদিকে অসহ্য শীত, অন্যদিকে মশার কামড়। কিছুই গ্রাহ্য করলেন না তারা-একমনে বসে রইলেন ভূতের আগমন অপেক্ষায়। কবি আর তাঁর বন্ধুরা বসে রইলেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। অনেকক্ষণ পর এলেন সাধক-বাবা। বাবাজীর আগমনে ভক্তিতে নজরুলের মাথা নীচু হয়ে এলেও সহযাত্রী বন্ধুদের মনে কিন্তু জেগেছে দারুন অবিশ্বাস। বাবাজীর বর্ণনা করতে গিয়ে নজরুলের এক সহযাত্রী নলিনী কান্ত সরকার লিখেছেন : চেহারা, গাত্রচর্ম, চর্মের উপরকার বর্ণ, অঙ্গ-সৌষ্ঠব ও অঙ্গ-কান্তি দেখে মনে হল যেন তিনি জমি চাষ করতে করতে লাঙ্গল ও বলদ ফেলে সদ্য ছুটে এসেছেন।

ঘরে ঢুকেই ভূতসিদ্ধ সাধক বাবাজী আদেশ দিলেন, যার যার পকেটে টর্চ ও দেশলাই আছে তা' তাঁর কাছে দিতে। অনেকের মনে সন্দেহের উদ্রেক হলেও সকলেই নির্বিবাদে তাঁর আদেশ পালন করলো। ঘর অন্ধকার। নিকষ অন্ধকার! এমন সময় বাবাজীর ঘরের টিনের চালার উপর কয়েকবার শব্দ হলো। বিড়বিড় করে কি যেন বকে চললেন তিনি। তারপর অনেকটা সময় "মন্ত্র-তন্ত্র" পড়ে তিনি আলো জ্বালালেন। দেখা গেলো, ঘরের চারকোণে সদ্য তোলা চারটা শিকড়! পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে নজরুল ঐ শিকড় ক'টাকে সঙ্গে করে কলকাতা ফিরলেন। অন্ধবিশ্বাসের উপর নির্ভর করে তা' দিয়ে নতুনভাবে আবার তিনি শুরু করলেন ভৌতিক চিকিৎসা! কিন্তু কিছুই ফল পেলেন না; কবি-পত্নীর রোগ বরং দিন দিন বেড়েই চললো।

এমনি করে শতলোকের শত মন্ত্রণায় বিশ্বাস করে সরল সহজ নজরুলকে জীবনে যথেষ্ট লাঞ্ছনা পেতে হয়েছে। তবু তিনি কখনো কোন মানুষকে সহজে অবিশ্বাস করতে পারেন নি।

www.phulkuri.org.bd

নজরুল তবুও দমলেন না। যে করেই হোক্ প্রমীলাকে রোগমুক্ত করতেই হবে। তাই বিনা দ্বিধায় পানির মতো টাকা খরচ করে চললেন। কিন্তু দরিদ্র কবির সার্মথ্যই বা কতটুকু! টাকার অভাবে দিশেহারা হলেন। এই সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন পুস্তক প্রকাশক ও গ্রামোফোন কোম্পানী তার সদ্ব্যবহার করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করলেন না। কবিরও তখন প্রয়োজন অর্থের। তাই তিনি তাঁর রেকর্ড আর লেখা পুস্তকের স্বত্ব বিক্রয় করলেন সামান্য টাকার বিনিময়ে। এমনি করে স্ত্রী আরোগ্যের জন্য কবির জীবরে সঞ্চিত অর্থ সবকিছুই সঁপে দিলেন অপরের হাতে। কিন্তু তাতেও পারলেন না তিনি তাঁর পত্নীকে সুস্থ করে তুলতে। মনে এলো তাঁর নৈরাশ্য। হতাশা আর ব্যর্থতায় কবির প্রাণ হাহাকার করে উঠলো। সব স্বপ্ন, সব সাধনাই যেন এক অদৃশ্য হাতের কুটিল ইঙ্গিতে ভেঙ্গে খান খান হলো।

এবার চির আনন্দ-মুখর কবির ঘটলো মানসিক অবনতি। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত দেশে বিদেশে ঘুরে শত-সহস্র চেষ্টাতেও যখন কবি তাঁর স্ত্রীর স্বাস্থ্য উদ্ধার করতে পারলেন না, তখন তিনি দিশেহারা হয়ে পড়লেন। ভাবলেন, ধন গেলো, জনও যাবে! না না, তা হতে দেবো না। দেবো না আমার প্রিয়জনকে কেড়ে নিতে! কবির মনে জেগে উঠলো বিদ্রোহ। এ বিদ্রোহ প্রকৃতির বিরুদ্ধে, একদিকে তাঁর মনের ক্ষোভ, অপরদিকে অভাব-অনটন তাঁকে পাগল করে তুললো। দুশ্চিন্তা আর দুর্ভাবনায় ঘটলো তার মানসিক অবনতি। এরপর থেকেই কবি হয়ে উঠলেন গম্ভীর। কথা বলেন কম, তন্ময় হয়ে চেয়ে থাকেন আপন ভাবে। কেউ ডাকলে সচকিত হয়ে ওঠেন্। একটু হাসেন, আবার সেই পূর্বভাব! কখনও বা কবি হারমোনিয়াম নিয়ে বসেন সঙ্গীত চর্চা করতে। ভুলে যান তিনি সে কথা! হঠাৎ ধ্যানমগ্ন ঋষির মতো চক্ষু মুদ্রিত করে বসে থাকেন খানিকক্ষণ। তারপর কোন বন্ধুর ডাকে হয়তো বা বিশাল দু'টি চোখ মেলে বলে ওঠেন : জানিস ভাই, আমি যেন ভিতরে ভিতরে কি অনুভব করি, কিন্তু বলতে পারি না। মনে হচ্ছে এক বিরাট দায়িত্ব এসে গেছে আমার উপর! হিন্দু-মুসলমানের মিলন বাণী কি কেউ শোনাবে না? বলেই কবি কিছু সময় আবার গম্ভীর হতেন। তারপরই গম্ভীর স্বরে হয়তো বলে উঠতেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি তার দেখা পেয়েছি। আসবে, সে আসবে। ঐ দেখ, কি অপূর্ব জ্যোতি! ...

www.phulkuri.org.bd

এমনি সব ঘটনার পর দিন-দিন কবির স্বাস্থ্য ভেঙ্গে চললো। বলিষ্ঠ দেহ হলো বিনষ্ট। তার চক্ষুর দু'টি হলো ক্ষীণ। প্রাণখোলা হাসির ফোয়ারা হলো রুদ্ধ। কণ্ঠের বাণী আর স্মৃতিশক্তি হলো লুপ্ত।

এলো ১৯৪২ সাল। ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে জেগে উঠলো সকল বিপ্লবী আত্মা। আগস্টের আন্দোলন সকলকে করে তুললো মুক্তিসৈনিক। সবার মুখেই, "করেঙ্গে ইয়ে মরঙ্গে"। আর তার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে উঠলো সমবেত সুর—

উষার দুয়ানে হানি আঘাত,
আমরা আানিব রাঙা প্রভাত;
আমরা দানিব নতুন প্রাণ—
বাহুতে নবীন বল।
চল্‌রে চল্‌রে চল!

বিদ্রোহী কবির এই করুণ পরিণতিতে দেশে নামলো শোকের ছায়া। জাতীয় কবির স্মৃতিশক্তি লোপ পেলো—তিনি হলেন জীবন্মৃত! তাই ১৯৫২ সালের ২৭ জুন দেশের সাহিত্য-প্রধানদের নিয়ে গড়া হলো "নজরুল নিরাময় সমিতি"। চিকিৎসার জন্য ১৯৫২-এর ২৫ জুলাই কবি পত্নীসহ তাঁকে পাঠানো হলো রাঁচি মেন্টাল হাসপাতালে, চার মাস চিকিৎসা করেও মেজর ডেভিস তাদের মূল রোগ নির্ণয় করতে পারলেন না।

তারপর ১৯৫৩ সালের ১০ মে কবি ও কবি-পত্নীকে নিয়ে যাওয়া হলো ইংলণ্ডে। সেখানকার পাঁচজন স্নায়ু-বিজ্ঞানবিদ্ ও মনোরোগ চিকিৎসাবিদের তত্ত্বাবধানের প্রায় ছয়মাসকাল চিকিৎসা চললো, কিন্তু তাতেও কোনরূপ ফল হলো না।

ইংলেণ্ডের পর ভিয়েনা। সেখানেও বিশিষ্ট চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে তাঁদের চিকিৎসা চললো, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। চিকিৎসকেরা বললেন, কবির নাকি আর আরোগ্য লাভের কোন আশা নেই। কিন্তু ডাঃ হক্ নামক জনৈক চিকিৎসক বললেন—সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ না করলেও, কবির এ-রোগের কিছুটা উন্নতির

www.pathagar.org.bd

আশা আছে। তাই তিনি নিজেই চিকিৎসার নির্দেশ দিয়ে দিলেন। কোলকাতায় বসেও নাকি ডাঃ হকের নির্দেশ-মত চিকিৎসা করা সম্ভব হচ্ছে।

১৯৫৩ সালের ১৪ ডিসেম্বর রোম হয়ে কবি ও কবি পত্নী ফিরে আসেন কোলকাতায়। কিন্তু কবির স্মৃতি-শক্তি আজো নিমজ্জিত। তিনি আজো বাক্-রুদ্ধ; অবশেষে কবি ১৯৭৬ সালে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে তাঁকে সমাহিত করা হইয়াছে।

—0—

www.phulkuri.org.bd

www.phulkuri.org.bd